وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ইতিছাম

الإعتصام

ইবনু উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত।

(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)।

●৭ম বর্ষ ●১ম সংখ্যা ●নভেম্বর ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٧، ربيع الثاني و جمادى الأول ١٤٤٤ هـ/ نوفمبر ٢٠٢٢م العدد: ١، الجزء: ٧٣
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

হযরত সুলতান মসজিদ, আস্তানা, কাজাখস্তান : কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় বৃহদাকার মসজিদটি উদ্বোধন করা হয় ২০১২ সালে। প্রায় ১৮০০০ বর্গমিটার আয়তনের নয়নাভিরাম মসজিদটিতে ১০০০০ মুছল্লী একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদটিতে ৫১ মিটার উচ্চতার একটি প্রধান গম্বুজের পাশে আরো ৮টি ছোট গম্বুজ রয়েছে আর চার কোণে রয়েছে ৭৭ মিটার উচ্চতার চারটি মিনার। মসজিদ কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার ও সেমিনার রুম।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২২ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৯

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ নভেম্বর	০৫ রবীউল আখের	মঙ্গলবার	**০৪.৪৮**	**০৬.০৪**	১১.৪২	০২.৫৫	**০৫.২০**	০৬.৩৬
০৫ ,,	০৯ ,,	বুধবার	০৪.৫০	০৬.০৬	১১.৪২	০২.৫৪	০৫.১৮	০৬.৩৪
১০ ,,	১৪ ,,	বৃহস্পতিবার	০৪.৫২	০৬.০৯	১১.৪২	০২.৫২	০৫.১৫	০৬.৩২
১৫ ,,	১৯ ,,	মঙ্গলবার	০৪.৫৫	০৬.১৩	১১.৪৩	০২.৫১	০৫.১৩	০৬.৩১
২০ ,,	২৪ ,,	রবিবার	০৪.৫৮	০৬.১৬	১১.৪৪	০২.৫০	০৫.১২	০৬.৩০
২৫ ,,	২৯ ,,	শুক্রবার	০৫.০১	০৬.১৯	১১.৪৫	০২.৫০	০৫.১১	০৬.৩০

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১
শরিয়তপুর	০	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	+১	-১
শেরপুর	+২	+৩	০
জামালপুর	+২	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	০	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৭	-৪
কক্সবাজার	-৭	-৮	-৭
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৫
রাঙ্গামাটি	-৮	-৯	-৫
বান্দরবান	-৯	-৯	-৫
কুমিল্লা	-৪	-৪	-৩
নোয়াখালী	-৪	-৪	-২
লক্ষীপুর	-৩	-৩	-১
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৬	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৪	-৩	-৬
মৌলভীবাজার	-৫	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৩	+২	+৪
বগুড়া	+৪	+৩	+৫
নওগাঁ	+৬	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৬	+৭	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৫	+৬	+৩
দিনাজপুর	+৮	+৯	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৪	+৫	+৭
লালমনিরহাট	+৫	+৬	+২
নীলফামারী	+৭	+৮	+৪
পঞ্চগড়	+৯	+১০	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৯	+১০	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৬
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৩	+৪	+৪
নড়াইল	+৩	+৩	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+১
পটুয়াখালী	-১	-১	+২
পিরোজপুর	+১	০	+৩
ঝালকাঠি	+৪	০	+২
ভোলা	-২	-২	০
বরগুনা	০	-১	+৩

৭ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯
রবী: আখের-জুমা: উলা
১৪৪৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দারসে হাদীছ**
সফলতা লাভে জিহ্বা সংরক্ষণের ভূমিকা ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ **প্রবন্ধ**
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৬) ০৬
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (শেষ পর্ব) ০৯
-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী
» বায়তুল মাক্বদিসের ফযীলত ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১
-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী
» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১২তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৯তম পর্ব) ১৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাস ১৮
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
» তাবীয ব্যবহার শিরক ২০
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» ইসলামে মুছাফাহার বিধান ২২
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

◈ **তরুণ প্রতিভা**
» পাশ্চাত্য বিশ্বে ইসলাম ফোবিয়া : সমস্যা ও সমাধান ২৫
-মাযহারুল ইসলাম

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
» ফ্রিডম অব চয়েস এন্ড কুরআনিক প্রেসক্রিপশন ২৮
-মো. হাসিম আলী
» র‍্যাগ-ডে সম্পর্কে ইসলাম ৩১
-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান

◈ **দিশারী**
» রোগ-ব্যাধি : ক্ষেত্র বিশেষে আপনিই দায়ী! ৩৩
-সাঈদুর রহমান

◈ **নারীদের পাতা** ৩৭
» বিবাহের ব্যবস্থা করুন!
-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৩৯
» আল্লাহর উপর ভরসা *-আব্দুল আহাদ আল-লাবীব*
» গরীবের উপকার *-মা'রূফা বিনতে মীযানুর রহমান*

◈ **কবিতা** ৪০

◈ **সংবাদ** ৪২

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সাবধান! ফুটবলজ্বরে আক্রান্ত হবেন না

২১ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২-এর পর্দা উঠতে যাচ্ছে। বিশ্বকাপের প্রথা ভেঙে জুন-জুলাইয়ের পরিবর্তে এবার বিশ্বকাপ মাঠে গড়াচ্ছে চলতি নভেম্বরেই। চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা 'ফিফা'-এর উদ্যোগে তৎকালীন ফিফা সভাপতি জুলে রিমের পরামর্শে সর্বপ্রথম ১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত প্রতি ৪ বছর পরপর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মাঝখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে এই প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল।

২১ আসর এবং ৯২ বছর পর প্রথমবারের মতো মরুর বুকে বসছে বিশ্বকাপের আসর। বিভিন্ন দেশ ঘুরে এবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে আয়োজিত হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ আসরটি। ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনে রেকর্ড খরচ করছে কাতার। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সাতটি ফুটবল বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে যা খরচ হয়েছে, তার চার গুণেরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে শুধু একটি বিশ্বকাপ আয়োজনেই। কাতারের ব্যয় ২২০ বিলিয়ন ডলার, টাকায় যা প্রায় ১৮ লাখ ৯৭ হাজার কোটি। সে তুলনায় গেলো বিশ্বকাপ আয়োজনে রাশিয়ার খরচ হয়েছিলো মাত্র ১৫ বিলিয়ন ডলার। এবারের বিশ্বকাপ আয়োজনে কাতারে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬৫০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, যাদের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

বিশ্বকাপ আসরের ক্ষতির শেষ নেই। যেমন- **(১)** এর মাধ্যমে দুনিয়াজুড়ে জুয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়। অথচ ইসলাম জুয়াকে শয়তানের কর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং এর নানাবিধ ক্ষতি উল্লেখ করে একে বর্জন করতে বলেছে *(দ্র. আল-মায়েদাহ, ৫/৯০)*। **(২)** নাচ-গান-বাজনার দুয়ার উন্মোচিত হয়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম *(দ্র. লুক্বমান, ৩১/৬; বুখারী, হা/৫৫৯০)*। **(৩)** এ ধরনের আয়োজনে নেশাজাতীয় দ্রব্য সরবরাহ তো ডাল-ভাতের মতো হয়ে থাকে। অথচ ইসলামে নেশাজাতীয় দ্রব্যকে পাপের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(দ্র. নাসাঈ, হা/৫৬৬৬)*। **(৪)** এর কারণে অনেক সময় ছালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত নষ্ট হয়। অথচ কেউ ছালাত নষ্ট করলে তার জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে *(দ্র. মারইয়াম, ১৯/৫৯)*। **(৫)** বিশ্বময় প্রচুর অর্থ বিনষ্ট হয়। আর অর্থ নষ্ট করা তো দূরের কথা, অপচয় করাও ইসলামে গর্হিত কাজ। অপচয়কারীকে ইসলাম শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যা দিয়েছে *(দ্র. আল-ইসরা, ১৭/২৭)*। **(৬)** মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সময় ও কর্মঘণ্টার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। অথচ মহান আল্লাহ সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বার বার এর কসম করেছেন *(দ্র. আল-আছর, ১০৩/১; আয-যুহা, ৯৩/১-২ ইত্যাদি)*। **(৭)** অবাধে নারী-পুরুষের একাকার হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। যা ফেতনার কারণ এবং ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৩; বুখারী, হা/৭৯৩)*। **(৮)** সতর আলগা করে খেলা হয়, যার মাধ্যমে শরী'আতের আইন লঙ্ঘিত হয় এবং ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য ইসলাম কারো সতরের দিকে তাকাকে নিষেধ করেছে *(দ্র. মুসলিম, হা/৩৩৮)*। **(৯)** এর মাধ্যমে অনেক মুসলিম খেলোয়াড়দের মডেল মনে করে এবং তাদের অনুসরণ-অনুকরণের চেষ্টা করে। অথচ রাসূল ﷺ-এর হুঁশিয়ারি হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*। **(১০)** ইহকাল বা পরকালে উপকার করতে পারে- এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে ব্রেনকে অন্য জায়গায় লাগানো হয়, যা মোটেও ঠিক নয়। সেজন্য একজন ভালো মুসলিমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা কোনো ব্যক্তির সুন্দর ইসলামের পরিচায়ক' *(তিরমিযী, হা/২৩১৭)*। **(১১)** এছাড়া খেলার জের ধরে সমাজে কত যে বিশৃঙ্খলা, ঝগড়াঝাটি, মারামারি, হানাহানি সংঘটিত হয়, তার হিসাব কে রাখে। এসব ক্ষতি যে শুধু ফুটবল বিশ্বকাপেই হয় তা কিন্তু নয়; বরং এ ধরনের ক্ষতি ক্রিকেটেও হয়ে থাকে।

কাতার বিশ্বকাপ ঘিরেও এ ক্ষতিগুলো হবে। এর ঢেউ আশেপাশের অন্যান্য আরবদেশেও আছড়ে পড়বে। ফলে বলাই যায়, কাতারসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিশ্বকাপের একটা সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে কারো জন্যই এধরনের খেলাধুলার প্রতি আসক্ত হওয়া এবং দেখা মোটেও সমীচীন নয়। বিশ্বের বড় বড় আলেম-উলামা এবং বিখ্যাত সব ফতওয়া বোর্ড এসব খেলাধুলা দেখার বিপক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় অনর্থক বিষয় বর্জন করে কেবল ইহকাল ও পরকালে উপকারী কাজকর্ম করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

সফলতা লাভে জিহ্বা সংরক্ষণের ভূমিকা

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

সরল অনুবাদ : সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যভাগ (লজ্জাস্থান) হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করব'।[১]

ব্যাখ্যা : এই হাদীছে জিহ্বা ও গোপনাঙ্গের অপব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদু'টি শরীরের সবচেয়ে বিপজ্জনক অঙ্গগুলোর অন্যতম। দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ হলো জিহ্বা এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ হলো যৌনাঙ্গ। পুরুষ হোক বা নারী হোক যদি কেউ তার জিহ্বাকে হারাম কথাবার্তা এবং গোপনাঙ্গকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে, তবে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেন। অর্থাৎ জিহ্বা এবং গোপনাঙ্গ হেফাযতের পুরস্কার হলো জান্নাত।

আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের মধ্যে অন্যতম হলো জিহ্বা। কথা বলা ও মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম এই জিহ্বা। মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় এটি। আল্লাহ বলেন, 'আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট প্রদান করিনি? *(আল-বালাদ, ৯০/৮-৯)*। আমাদের অন্তরে যে কল্পনার উদ্রেক হয়, তার প্রকাশ এর মাধ্যমে হয়। অতএব জিহ্বা যেমন মানুষের কল্যাণ লাভের মাধ্যম, তেমনি তার অকল্যাণের উৎস। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের পার্থক্য করা জিহ্বা ব্যতীত সম্ভব নয়।

জিহ্বা অন্তরের মুখপাত্র ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিনিধি। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। জিহ্বার সংশোধনে তারা সংশোধিত আর তার কলুষতায় তারা কলুষিত হয়। আবূ সাইদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন আদম সন্তান সকাল করে, তখন তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট বিনীত হয়ে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তোমার মাধ্যমে পরিচালিত হই। যদি তুমি সোজা থাক, তবে আমরাও সোজা থাকি। আর যদি তুমি বক্র হও, তবে আমরাও বক্র হয়ে যাই'।[২] অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্ষমতা ও অক্ষমতার উপর জিহ্বা প্রভাব বিস্তার করে। অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, ধ্বংসযজ্ঞ ও সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে জিহ্বার ব্যাপক বিধ্বংসী প্রভাব রয়েছে। মালেক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন তুমি হৃদয়ে কঠোরতা, শরীরে অক্ষমতা এবং জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখবে, তখন তুমি মনে করবে যে, তুমি এমন সব কথা বল, যার কোনো অর্থ নেই।[৩]

সংঘটিত যে কোনো অবাধ্যতায় জিহ্বা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, যে এক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, এর ফলাফলকে গুরুত্বহীন মনে করবে, যা ইচ্ছে তাই বলবে, বেপরোয় কথা বলবে; এর মাধ্যমে তার পাপ ও পদস্খলনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এর ক্ষতি থেকে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না সে শারঈ বাধ্যবাধকতার জালে একে আটকাবে। সুতরাং কিছু বলার পূর্বে প্রত্যেককে ভেবে নিতে হবে। যদি সেখানে কল্যাণ দেখা যায়, তবে কথা বলবে আর যদি অকল্যাণ দেখা যায়, তবে চুপ থাকবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৪]

জিহ্বার বিচরণক্ষেত্রের কোনো সীমানা নেই। এর রাজত্ব সর্বত্র বিরাজমান। এর ধ্বংস ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী। তাই এই উম্মতের আলেম ও সৎকর্মপরায়ণশীলগণ জিহ্বার পরিণাম সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করেছেন। এর ধ্বংসাত্মক ক্ষেত্র সম্পর্কে ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকেছেন। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এটি আমাকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য করে।[৫]

---

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪।

২. তিরমিযী, হা/২৪০৭, হাসান।

৩. ফায়যুল ক্বাদীর (দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, লেবানন : প্রথম প্রকাশ- ১৪১৫ হি.), ১/৩৬৯।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭।

৫. সিলসিলা ছহীহা, পৃ. ৫৩৫; মুসনাদে বাযযার, পৃ. ৮৪।

ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ছাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে বললেন, ‘তোমরা অবশ্যই জিহ্বা সম্পর্কে সতর্ক থাকো। ভালো কথা বলতে থাকো সেটা তোমাদের জন্য গনীমত হিসেবে গণ্য হবে। অশ্লীল বলা থেকে বিরত থাকো, তবে অনুশোচনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে’।[৬] উমার ইবনু আব্দিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সকল রহস্য গচ্ছিত রাখার উৎস হচ্ছে হৃদয়, ঠোঁট হলো এর তালা এবং জিহ্বা হলো এসকল রহস্য উন্মোচনের চাবি’।[৭]

জিহ্বা অপব্যবহারের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এটি সকল অনিষ্টের মূল। সকল পাপের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এটি। বিচক্ষণতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের মাপকাঠি এটি। সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন, তার মধ্যে অধিক ভয়ংকর কোন জিনিস? সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটা।[৮] এর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার জীবনকে যে কোনো সময় বিপন্ন করে তুলতে পারে। অত্যন্ত নরম কোষে গঠিত এই ইন্দ্রিয়ের সংযত ব্যবহার মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায়। কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর যিকির, তাসবীহ পাঠ ইত্যাদির মধ্যে একে সীমিত রাখা জ্ঞানীদের কাজ। কারণ তখন স্মৃতিতে কেবল আল্লাহ তাআলার যিকির বিদ্যমান থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু বিশর রহিমাহুল্লাহ বর্ণিত হাদীছে এসেছে। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার নিকট শরীআতের বিষয় বেশি হয়ে গেছে। অতএব, আপনি আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা আমি আঁকড়ে ধরতে পারি। তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখো’।[৯]

মানুষের উচ্চারিত শব্দের প্রভাব অত্যন্ত ভয়বহ। এর উপরেই তার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। ইহকালীন জীবনে সুখ ও পরকালীন জীবনে শান্তি এর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। এর আলোকে আল্লাহ তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাইতো এর সংরক্ষণের জন্য সদাপ্রস্তুত ফেরেশতামণ্ডলী রেখেছেন। মানুষ যখনই কোনো বাক্য উচ্চারণ করে, তখনই তা সংরক্ষণের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সদাপ্রস্তুত ফেরেশতামণ্ডলী রয়েছেন *(ক্বাফ, ৫০/১৮)*।

জিহ্বার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পাপ সংঘটিত হয়। এর পাপ থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে কঠিনভাবে সংযমের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। একান্তই কঠিন নির্যাতনের শিকার না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তি কারও সমালোচনায় লিপ্ত হতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মন্দ বিষয়ের প্রকাশ মোটেই পছন্দ করেন না তবে কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত হলে সেটা ভিন্ন কথা *(আন-নিসা, ৪/১৪৮)*। অর্থাৎ কেবল নির্যাতিত ব্যক্তিই কষ্টের কথা নিষ্কৃতি প্রাপ্তি কিংবা সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে অন্যকে অবহিত করতে পারে।

একজন মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলিমের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। কারও জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত যেন বিপন্ন না হয়, সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনে শরীআত বিশেষ তাগিদ দিয়েছে। কোনো ব্যক্তির চরিত্র, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলা, তার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হওয়া, হিংসা বা শত্রুতাবশত তার দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। তিনি বলেছেন, ‘তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নাই সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো না। নিশ্চয় শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

ধারণাপ্রসূত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কারও সমালোচনা বা মন্তব্য করা যাবে না। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা করা থেকে বিরত থাকো; কেননা কতক ধারণার কারণে পাপ হয়’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*। কারও সম্পর্কে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা মুমিন নারী-পুরুষকে এমন অভিযোগে অভিযুক্ত করে কষ্ট দেয় যার সাথে সে সম্পৃক্ত নয় তবে তারা মিথ্যা অপবাদ দিল এবং সুস্পষ্ট পাপ সংঘটিত করল’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*।

৬. ত্বাবারানী, হা/১০৪৪৬; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, পৃ. ৪৯৩৩।
৭. মাওয়ারদী, আদাবুদ্দুনয়া, পৃ. ৩০৮।
৮. তিরমিযী, হা/২৪১০, হাদীছ ছহীহ।
৯. মুসনাদে আহমদ, হা/১৭৬৮০; তিরমিযী, হা/৩৩৭৫, হাদীছ ছহীহ।

একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, চিন্তাভাবনা ও কর্মপন্থা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত হয়। স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ তার জন্য শোভা পায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে নিযুক্ত সংরক্ষক ফেরেশতা রয়েছে। তারা হলেন সম্মানিত লেখকদ্বয়। তোমরা যা কর তা সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত’ *(আল-ইনফিত্বার, ৮২/১০-১২)*।

গীবত, চোগলখোরি, পরনিন্দা, পরচর্চা বর্তমান সমাজের অতি পরিচিত চিত্র। পারিবারিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, চায়ের দোকানে, বিনোদন স্পটে এর ব্যাপকতা লক্ষণীয়। গীবত, পরনিন্দা ও পরচর্চা চলতে থাকে। কিন্তু এর পরিণাম সম্পর্কে খুব কম মানুষই সতর্কতা অবলম্বন করে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলে, যার পরিণাম সমর্কে সে মোটেও ভাবে না। অথচ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিয়ে দেন’।[১০] কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা খুব সহজ, তবে এটা কতটা সঠিক বা কতটুকু যৌক্তিক সে ভাবনা থেকে মুখ ফিরানোর সুযোগ নেই। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন জিনিস অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে? তিনি উত্তরে বলেন, ‘মুখ ও লজ্জাস্থান’।[১১]

জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত সবকিছুই ফেরেশতারা সংরক্ষণ করে রাখেন। কিয়ামতের দিন এগুলোর হিসাব দিতে হবে। সেদিন জিহ্বা, হাত-পাসহ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে’ *(আন-নূর, ২৪/২৪)*।

মানুষকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৌতুক, হাসির গল্প ইত্যাদি অনর্থক কথা বলার অনুমোদন ইসলাম করে না। আল্লাহ বলেন, ‘মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরীদ করে, আর তারা সেগুলোকে হাসিঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি’ *(লুক্বমান, ৩১/৬)*। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে শুধু এজন্য কথা বলে যে, মানুষকে হাসাবে। ফলে সে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস’।[১২]

জিহ্বার ভয়াবহ প্রভাবের অন্যতম দিক হলো মানুষের সকল সৎ আমল ধ্বংস করে দেওয়া। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে ফরয ও নফল ইবাদত যথাযথভাবে পালনের কথা বললেন। তিনি আরও বললেন, ইসলামের স্তম্ভ হলো ছালাত এবং একে গতিশীল রাখার উপায় হলো জিহাদ। কিন্তু জিহ্বার অপব্যবহারের কারণে উল্লিখিত সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি মুআযকে কঠিনভাবে সতর্ক করেন। কারণ জিহ্বার উপার্জিত অপকর্মই সকল সৎ ইবাদত ধ্বংসের মূল।[১৩]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কথা বলার ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া। যাবতীয় পাপের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট জিহ্বার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আবূ আহমাদ শাকাল ইবনু হুমাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি দু‘আ শিক্ষা দিন, তিনি আমাকে এই দু‘আ পড়তে বলেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কানের অনিষ্টতা, চোখের কুদৃষ্টি, জিহ্বার কুবাক্য, অন্তরের কপটতা ও কামনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই’।[১৪] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে বোঝার ও আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৮।
১১. তিরমিযী, হা/২০০৪, হাসান।
১২. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৬৭, হাসান।
১৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০১৬ (সংক্ষেপিত)।
১৪. আবূ দাঊদ, হা/১৫৫১, হাদীছ ছহীহ।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী***

(পর্ব-৬)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাধ্যম ও লক্ষ্যের ঠেলাঠেলির মাঝে দ্বীনী কার্যক্রম

যেসব অতিউৎসাহী যুবক পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চায় এবং আল্লাহর শরী'আত প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের অনেকের নিকট তাদের আবেগ, কর্ম ও দাওয়াতের মহাসমুদ্রে শরী'আতের বহু বক্তব্য তালগোল পাকিয়ে যায়। চিন্তা-চেতনায় তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার এ ব্যাপারটি থেকেই আল্লাহর দিকে দাওয়াত বা ইসলামী কাজের[১] স্বরূপ বুঝার ক্ষেত্রে সর্বদা তৈরি হয় তার চেয়ে বড় ভুল।

সেজন্য আপনি তাদেরকে যুবকদের সমবেত করা, সুসংগঠিত করা, দল গঠন করা ও তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে পুঞ্জীভূত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে দেখবেন। এগুলোকে যদি জায়েযও ধরে নেওয়া হয়, তবুও এর সবই যে মাধ্যম এবং একটাও যে লক্ষ্য নয়, চিন্তা-চেতনার ত্রুটির কারণে সে বিষয়ে তারা উদাসীন বা উদাসীনতার ভানকারী।

আমরা যেমনটি সাব্যস্ত করেছি যে, আল্লাহর জন্য যাবতীয় দাসত্ব ও ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্তরে তাওহীদের ভিত্তিগুলো গ্রোথিত করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমই হচ্ছে শরী'আতের আওতায় থেকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, কল্যাণের উপদেশ দেওয়া, ভালোকাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা। 'এটা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কেননা আল্লাহর দিকে দাওয়াত একটি স্বভাবজাত ও সহজ বিষয়, কুরআন-সুন্নাহয় যার রূপরেখা সুস্পষ্ট। কোনো সময় এবং কোনো জায়গায় বাস্তব রূপ বা বাহ্যিক রূপ কোনো ক্ষেত্রেই **এই দাওয়াতের নবুঅতী পদ্ধতি ও মানহাজ থেকে বের হওয়ার কোনো দরকার নেই।** এই পদ্ধতিতে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং এর দাবি মানুষের অন্তরে গ্রোথিত করার জন্য কাজ করে যাওয়াই প্রত্যেকটি যোগ্য ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা তা দলীয় সংকীর্ণতার অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ এভাবে দাওয়াত দিলে ব্যাপক বিস্তৃত নবুঅতী পদ্ধতিতে আমল করা হয়। **আর শরী'আতের মূলনীতি বিষয়ে যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একাজ করা ওয়াজিব।** তিনি দলে যোগদানের দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। কারণ দাওয়াতী কাজে যোগদানের বিষয়টি দ্বীনের স্বীকৃত ও জ্ঞাত বিষয়। সেজন্য তিনি লোক তৈরির কাজে এবং মুসলিমদেরকে তাদের দ্বিতীয় অপরিচিত অবস্থা থেকে বের করে আনতে ময়দানে নামার অপেক্ষায় থাকবেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ 'ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল এবং অচিরেই তা আবার শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর টিকে থাকবে, তাদের জন্য সুসংবাদ'।[২] এই অপরিচিত অবস্থা কেবল সেভাবে দূর করা সম্ভব হবে, যেভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছিল প্রথম অপরিচিত অবস্থা। ইমাম মালেক رحمه الله যথার্থই বলেছেন, لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا 'এই উম্মতের প্রথম যুগের মানুষগুলো যা দ্বারা সংশোধিত হয়েছিলেন, শেষের মানুষগুলো তা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কস্মিনকালেও সংশোধিত হতে পারে'। **আর তা হয়েছিল নবুঅতী মানহাজ অনুসরণের মাধ্যমেই।**

প্রথম যুগের মানুষগুলো এই নীতির উপর চলেছেন। অতএব, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারাই 'জামা'আতুল মুসলিমীন' বা মুসলিমদের জামা'আত। তারাই প্রবৃত্তিপূজা ও সন্দেহ-সংশয়ের রোগ থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার ধারক-বাহক। যারা প্রকৃতপক্ষে বা মানহাজগতভাবে শরী'আত বহির্ভূত কোনো নামে বা কোনো পরিকল্পনায় জামা'আতুল মুসলিমীন থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তাদের জামা'আতকে ছেড়ে গেছে, তারা জামা'আতুল মুসলিমীন নন।

অতএব, **বৃদ্ধি করে বা কমিয়ে দিয়ে** এমন কোনো পদ্ধতি পেশ করা যাবে না, যা নবুঅতী মানহাজের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ

---

* বইটির লেখক আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল-আছারী (জন্ম : ১৩৮০ হিজরী) একজন ফিলিস্তীনী সালাফী আলেম। তিনি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শায়খ আলবানী, শায়খ ইবনে বায, শায়খ বাকর আবূ যায়েদ, শায়খ মুক্বিল ইবনে হাদী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম শায়খ আলী আল-হালাবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ আলোচক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

** বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. এটা তাদের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫।

www.al-itisam.com

দাওয়াতী পদ্ধতিতে নামে বা পরিকল্পনায় যে কোনো ধরনের ত্রুটি ইসলাম ও মানবহৃদয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সেটা তখন ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। আর ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির আশা করা যায় না'।[৩]

উপর্যুক্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হলে এখন আমি বলতে চাই, যদি কেউ ধারণা করে যে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যেহেতু সঠিক, সেহেতু দাওয়াতী মাধ্যমগুলোতে দাঈর জন্য প্রশস্ততা রয়েছে। **ফলে তিনি প্রত্যেকটা সময়ে অবস্থা বা স্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি চয়ন করতে পারেন,** তাহলে তার সেই ধারণা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই।

আমরা আরো বলতে চাই, উপরে যে সূত্র বা মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সবসময় গ্রহণযোগ্য নয়। সূত্রটি হচ্ছে, لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ 'উদ্দিষ্ট বিষয়ের যে হুকুম, মাধ্যম বা উপকরণেরও সেই একই হুকুম'। 'কারণ উপকরণ কখনও এমন অনিষ্ট ধারণ করতে পারে, যার জন্য সেই উপকরণটাই মাকরূহ বা হারাম হয়ে যায়। অথচ যে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সেটিকে মাধ্যম বা উপকরণ হিসেবে ধরা হচ্ছে, সেই লক্ষ্য হারামও নয়, মাকরূহও নয়'।[৪]

বর্তমান সংগঠন ও দলগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হুবহু এরকমই। এগুলোর উপস্থিতি দাঈগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে, মনের রোগ সারিয়ে তোলা জটিল করে দিয়েছে, উম্মতকে ভাগ ভাগ করে ফেলেছে এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। যদিও আমরা স্বীকার করি যে, 'মুসলিমদের জন্য এসব ইসলামী জামা'আতের অনেক অবদান রয়েছে, যা কেবল জেদী ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে'।[৫]

সংগঠনগুলোর উপস্থিতিকে ইজতেহাদী মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হলেও উলামায়ে কেরামের নিকট সেগুলো এমন মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বৈধ কোনো বিষয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা সাধারণত কোনো অকল্যাণ ও অনিষ্ট অর্জনের লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু (দেখা যাচ্ছে) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো অকল্যাণের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলোর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি'।[৬] **আর এরকম মাধ্যম নিষিদ্ধ।**

আমাদের কোনো দাঈ যদি তার আশেপাশে তাকান, তাহলে তিনি মানুষের কতগুলো ভাগ খুঁজে পাবেন? তিনি তাদেরকে এভাবে দেখতে পাবেন-

(১) কাফের বা নাস্তিক।

(২) মুসলিম, তবে নিস্তেজ। কিছু ফরযও পরিত্যাগ করে এবং কিছু পাপেও জড়িয়ে পড়ে।

(৩) মুসলিম, যিনি ফরয বাস্তবায়ন করেন এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকেন। তবে তিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াতী কার্যক্রমে যথেষ্ট ঢিল।

(৪) আগের শ্রেণির মতোই, তবে তিনি কোনো দলাদলিতে না গিয়ে ইসলামের স্বাভাবিক নিয়মে ও সুন্নাহ মাফিক দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(৫) ইসলামী দল ও দাওয়াতী সংগঠন।

আপনি মুসলিমদের উপর্যুক্ত ৪টি শ্রেণির দিকে দেখুন এবং ভাবুন :
আপনি বিভক্তির জ্বলন্ত আগুন কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
আপনি অন্তরের রোগ কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
আপনি ধারালো দৃষ্টি কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?
প্রকাশ্য বিভক্তি কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
ক্রুর হাসি কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
সমর্থন ও ধোঁকা কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
সতর্কীকরণ ও বিতাড়ন নীতি কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
আলোচনা-সমালোচনা কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
স্বেচ্ছাচারিতা ও মন্তব্য কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?
নানা ভ্রান্ত গুজব কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?
ব্যর্থ আহ্বান কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন?

আমি নিশ্চিত যে, প্রশ্নগুলোর মাঝেই উত্তর রয়েছে। সুতরাং উত্তর পাওয়ার জন্য আপনাকে মোটেও মেহনত করতে হবে না। 'অতএব, আজ ভিন্ন ভিন্ন ইসলামী জামা'আত ও ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্ব রোগে পরিণত হয়েছে, যা কোনোভাবেই অব্যাহত থাকতে পারে না। এই রোগ নিরাময়ের জন্য প্রত্যেকটা মুসলিমই দায়িত্বশীল। তাহলে মুসলিমরা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে এবং দ্বীন পুরোটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। মুসলিমদের অবস্থা তো ঠিক এরকম ছিলো- خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'সর্বোত্তম উম্মত, মানবতার কল্যাণের জন্য যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে'।[৭]

অতএব, বলা যায়, 'মহান আল্লাহর দাসত্ব এবং সেদিকে দাওয়াত দেওয়ার যে মহান লক্ষ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য ও অন্যান্য দ্বীনী কাজের জন্য বিভিন্ন দলকে বাহ্যিকভাবে সুসংগঠিত মাধ্যম মনে হলেও তা আজ উম্মতের দেহে বিদঘুটে এক আকৃতি ধারণ করেছে... সেগুলো আজ বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে... সেগুলো আজ দ্বীনী কাজের নানা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখান থেকে অন্যান্য দল ও দাঈর বিরুদ্ধে নানান তকমা লাগানো হচ্ছে। এসব দল আজ ব্যক্তিক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, যাতে লড়াইয়ে টিকে থাকা যায়, মাল হাতিয়ে নেওয়া যায় এবং দখলদারিত্ব চালানো যায়'।[৮]

সারকথা হচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই শরী'আত বহির্ভূত এমন কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না, যে ব্যাপারে দলীল নেই, অথবা এমন কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না, যা মূলত শরী'আতসম্মত, কিন্তু তা অকল্যাণ ও অনিষ্টের দিকে নিয়ে

৩. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ৭৪-৭৫।
৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১/১১৬।
৫. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-জামাঈ, পৃ. ২৭।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, এ'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন, ৩/১৩৬।
৭. মুহাম্মাদ সুরূর যায়নুল আবেদীন, মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ দাওয়াতি ইলাল্লাহ, ১/১৬৮।
৮. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৪৯-১৫০।

যায় এবং কিতাব বা সুন্নাতের পরিপন্থী হয়। কেননা ‘যা কিছু ফেতনা ও বিভক্তি অবধারিত করে দেয়, তার কোনোটাই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক’।[৯]

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করে দিবে। বিষয়টি হচ্ছে, একজন মুসলিম শরী‘আতবিষয়ক তার সকল আমল কেবল মহান এক লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে সম্পাদন করে থাকে। আর সেই লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলার দাসত্ব এবং একমাত্র তার জন্যই যাবতীয় ইবাদত নিবেদন।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতও ঠিক এরকমই। সেটিও হৃদয়গহীনে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠার এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম। সাথে সাথে সেটি একটি ইবাদতও বটে।

আর সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হচ্ছে, কোনো ইবাদতের নির্দেশনাসম্বলিত দলীল না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকতে হবে এবং সেই ইবাদতটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সংক্রান্ত বই-পুস্তকে মূলনীতিটি সাব্যস্ত রয়েছে।[১০]

অতএব, এখানে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর কোনো অবকাশ নেই, নেই কোনো ইজতেহাদের সুযোগ।... বরং ক্ষেত্রটি সর্বদা ইবাদতের ক্ষেত্র, যেখানে ক্বিয়াস করা ও ব্যক্তিঅভিমত ব্যক্ত করার কোনো জায়গাই আসলে নেই। ফলে আল্লাহর দিকে দাওয়াত ‘লক্ষ্যের দিক থেকে মর্যাদার এবং মাধ্যমের দিক থেকে পুতপবিত্র’।[১১] ‘অতএব, কোনো অবস্থাতেই আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, আমরা আল্লাহর দিকে দাওয়াতকে বহিরাগত কোনো সাংগঠনিক পোশাক করাবো এবং তার পেছনে সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করব, যা আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মূলনীতি ও মূল কাঠামো ধ্বংস করে ছাড়ে এবং বিভক্তি সৃষ্টি করে।

বুঝা গেল, মাধ্যম ও লক্ষ্য দুইয়ে মিলেই হচ্ছে দাওয়াত। দাওয়াতের রূপরেখা একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়, সময়-স্থান[১২]-অবস্থাভেদে যার নড়চড় হয় না। **অনুরূপভাবে দাওয়াত প্রচারের মাধ্যমের ক্ষেত্রেও মূলনীতি হচ্ছে, নবুঅতী পদ্ধতির উপর অবিচল থাকতে হবে।**[১৩] কেননা, মহান আল্লাহ তার বান্দাদের যেসব মাধ্যম অবলম্বনের কথা বলেছেন, তার সবই ইবাদত’।[১৪]

দাওয়াতের যেসব মাধ্যম বর্তমান যুগে আছে, আগে ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে, সেগুলো দাওয়াতের এমন মাধ্যম হওয়া একান্ত জরুরী, যেগুলো দিয়ে নবী ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যেগুলোর মাধ্যমে তিনি কাঙ্ক্ষিত দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। কতিপয় দিক ছাড়া মাধ্যমগুলো আমাদের যুগে ভিন্ন কিছু হবে না, **যে দিকগুলোর নিবিড় সম্পর্ক থাকবে মূল মাধ্যমগুলোর সাথে।**

তবে এই ভিন্নতা শরী‘আতের খাঁচায় বন্দী হতে হবে এবং কিতাব ও সুন্নাতের ওযনে মিলতে হবে। যখনই তেমনটা হবে না, তখনই সেই মাধ্যমকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে বিরত হওয়া আবশ্যক।

পূজা করা হয় এমন নতুন নতুন মাধ্যম[১৫] চলবে না’।[১৬] কারণ ‘দাওয়াতের পথ একটাই। যে পথে আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার ছাহাবীগণ চলেছেন, চলেছেন অন্য দাঈগণও এবং তাদের পরে সে পথে আল্লাহর তাওফীক্বে আমরাও চলব। সেই পথ হচ্ছে, ঈমান, আমল, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পথ।... রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ঈমান ও আমলের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করেছেন।... ফলে আক্বীদার শক্তি ঐক্যের শক্তির সাথে মিশে তাদের জামা‘আতটা মডেল জামা‘আতে পরিণত হয়েছে। যে জামা‘আতের কালেমা বুলন্দ হবেই, যার দাওয়াত বিজয়ী হবেই- যদিও সারা পৃথিবীবাসী বিরোধিতা করে’।[১৭]

এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর বিশদ বিবরণ অনেক দাঈর নিকট জটিল হয়ে গেছে। অতএব, এ ব্যাপারে সূক্ষ্মতা অবলম্বন করা এবং এর মর্মার্থে তালগোল পাকিয়ে না ফেলা একান্ত জরুরী। কোনো ধরনের স্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব, উত্তম বিবেচনা, অভিমত, চর্চা ও প্রবণতার কাছে এটা যেন লুণ্ঠনের শিকার না হয়।

(চলবে)

---

৯. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, আল-ইসতেক্বমাহ, ১/৩৭।

১০. আমার প্রণীত ‘ইলমু উছূলিল বিদা‘ বইয়ে আমি মূলনীতিটির উপর বিস্তারিত কথা বলেছি। সুতরাং সেখান থেকে বিষয়টি দেকে নিতে পারেন।

১১. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, ফুছূলুন মিনাস সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ, পৃ. ৭৯।

১২. ‘মাশরূ‘ইয়্যাতুল আমাল আল-জামাঈ’ বইয়ের ৭৯ পৃষ্ঠার বক্তব্যের সাথে তুলনা করে দেখুন।

১৩. ‘আল-মুসলিমূনা ওয়াল আমাল আস-সিয়াসী’ বইয়ের ২৬-২৮ পৃষ্ঠার বক্তব্যের সাথে তুলনা করে দেখুন।

১৪. আল-উবূদিয়্যাহ, পৃ. ৬৬।

১৫. যেমন- মাল-সম্পদকে মানুষ জমায়েত করার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। ‘দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে তারা এমন সব মাকাল ফল সদৃশ পদ্ধতি ব্যবহার করে, খ্রিষ্টান মিশনারী যেগুলোর চর্চা করে থাকে’। মাল কম তো ঈমান কম!! মাল নেই তো চুক্তিও নেই!! এগুলো আমরা চাক্ষুষ দেখেছি এবং এগুলোর হীনতা আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছি। আর ‘কোনো সংবাদ শোনা চাক্ষুষ দেখার মতো নয়’।

যাকাতে ‘আল-মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম’-এর অংশের সাথে দাওয়াতী কাজে ঢালাওভাবে মালের ব্যবহারকে তুলনা করা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এটি এমন একটি তুলনা, যা উল্লেখ করলেই তার আর জবাব দেওয়া লাগে না *(উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতরের অংশ ‘মানহাজুদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ’ বই থেকে গৃহীত; সেখান থেকেই ‘হুকমুল ইনতিমা’ বইয়ে গৃহীত হয়েছে, পৃ. ১০০)*।

১৬. আল-উবূদিয়্যাহ, পৃ. ৬৬।

১৭. মুস্তাফা মাশহূর, ত্বরীকুদ-দাওয়াহ, পৃ. ১৩; তার কাছ থেকে সুলায়মান মারযূক ‘আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বায়নাল ফারদিয়্যাহ ওয়াল জামা‘ইয়্যাহ’ বই উল্লেখ করেছেন, পৃ. ৭।

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(শেষ পর্ব)

(১১) তাওহীদ : সূরা আন-নাবাতে তিন প্রকার তাওহীদই রয়েছে। যথা-

(ক) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ : আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, হায়াতদাতা, মৃত্যুদাতা, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, লালন-পালনকর্তা, সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনিই আসমান-যমীনের মালিক, সকল বিষয় তারই হাতে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ 'যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুর, যিনি দয়াময়, তাঁর নিকট কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না' *(আন-নাবা, ৭৮/৩৭)*। আয়াতটি তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ-এর প্রমাণ বহন করে। কারণ মহান আল্লাহই হলেন সকলের লালন-পালনকর্তা, যেটি 'রব' শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনিই আসমান-যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুর প্রতিপালক।

(খ) তাওহীদে উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ : সকল প্রকার ইবাদত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, যবেহ, কুরবানী, নযর-মানত, দু'আ-প্রার্থনা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা, চাওয়া-পাওয়াসহ সকল ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিকটতম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফের বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! *(আন-নাবা, ৭৮/৪০)*। এই আয়াতটিতে প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যেসব কর্ম আগে প্রেরণ করেছে, সৎকর্ম নাকি পাপ কর্ম, সে অনুযায়ী সেই ব্যক্তি প্রতিদান পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই সাহায্য চাই, *(আল-ফাতেহা, ১/৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ 'যিনি মানবমণ্ডলীর প্রকৃত মা'বূদ' *(আন-নাস, ১১৪/৩)*।

(গ) তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহতে আল্লাহ তাআলার যেসব উত্তম নাম ও গুণ রয়েছে, সেগুলোর কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া, পরিবর্ধন ছাড়া, কারো সাথে সাদৃশ্যতা স্থাপন করা ছাড়া এবং কেমন বা কীভাবে- এরূপ ধরন নির্ধারণ ছাড়া, সেগুলো অস্বীকার না করে হুবহু যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ 'সেদিন রূহ (জিবরীল) ও দিবেন ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন, দয়াময় যাকে অনুমতি তিনি ব্যতীত অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে' *(আন-নাবা, ৭৮/৩৮)*। আয়াতে 'আর-রহমান' আল্লাহর একটি অন্যতম গুণবাচক নাম। তিনি করুণাময় ও দয়ালু। বিধায় তিনি আমাদের উপর করুণা ও দয়া করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ 'যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু' *(আল-ফাতেহা, ১/২)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'আর আল্লাহর অসংখ্য উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নাম দ্বারা ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন করবে, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮০)*। আল্লাহর উত্তম নাম ও গুণাবলিকে কোনো ধরনের বিকৃত করা যাবে না। যেমন তাঁর হাত রয়েছে। এটা প্রকৃত অর্থেই হাত বলতে হবে, কুদরতী ও নেয়ামতী হাত নয়। তিনি প্রকৃতভাবেই দেখেন, শুনেন ইত্যাদি। সাথে সাথে আল্লাহর গুণাবলিকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে কোনো সৃষ্টির সাথে সেগুলো তুলনা করা যাবে না। এমন বলা যাবে না যে, আমার হাতের মতোই আল্লাহর হাত, আমার পায়ের মতোই আল্লাহর পা (নাঊযুবিল্লাহ)। বরং বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর হাত, পা, দেখা-শুনা, কথা বলা, হাসা-এগুলো আল্লাহর জন্য যেভাবে প্রযোজ্য তেমনই রয়েছে। আর মানুষ মরণশীল, আজ সে জীবিত আছে কিন্তু এক সেকেন্ডের মধ্যে তার অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। বিধায় মানুষের গুণাবলি মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। তেমনই আল্লাহর গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। কোনো সৃষ্টির সাথে আল্লাহর কোনো গুণের তুলনা করা চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলো! তিনিই আল্লাহ একক (ও অদ্বিতীয়)। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়' *(আল-ইখলাছ, ১১২/১-৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি আসমানসমূহ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবারই প্রতিপালক। সুতরাং তুমি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকো, তুমি কি তাঁর সমনামসম্পন্ন (তাঁর সাদৃশ্য বা সমতুল্য) কাউকেও জানো? *(মারইয়াম, ১৯/৬৫)*। আয়াতটিতে তিন প্রকার তাওহীদের কথাই বলা হয়েছে। সমস্ত ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই করতে হবে। প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, হায়াতদাতা, মৃত্যুদাতা, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহই। সুতরাং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তিনি একক। 'সামিয়্যা' শব্দটি থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। সুতরাং তাঁর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না। যেমন আল্লাহকে ডাকেন এভাবে, يَا رَحْمَنُ হে করুণাময়! আমার উপর করুণা করো, দয়া করো, يَا غَفُوْرُ হে গফূর! বা মহা ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করো। এভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির অর্থ বুঝে তাঁকে ডাকতে হবে। আল্লাহ

* পি.এইচ.ডি গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া।

তাআলার করুণা এবং ক্ষমার সাথে অন্য কারো করুণা ও ক্ষমাকে তুলনা করা যাবে না। এভাবে মানব জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক ও বিদআতসহ অন্যান্য পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব কেউ যদি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে চায়, সে যেন তার জীবনে পরিপূর্ণভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল প্রকার শিরক-বিদআতসহ অন্যান্য পাপকাজ পরিত্যাগ করে।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ‘নিশ্চয়ই ইবরাহীম এক জাতি ছিলেন, যিনি আল্লাহর অনুগত ও একমুখী আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’ *(আন-নাহল, ১৬/১২০)*। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন, মানব জাতির উত্তম আদর্শের প্রতীক এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁকে আগুনে ফেলা হয়েছে কিন্তু তিনি আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আবার সন্তানকে কুরবানী করার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শিরকী কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বিপদ-মুছীবতে সর্বদায় আল্লাহর উপর অবিচল থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতেন এবং শিরকী কাজ থেকে নিজেও দূরে থাকতেন, পাশাপাশি সন্তানদেরকেও দূরে রাখতেন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ ‘আর যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫৯)*।

(১২) মাটির মানুষ মাটিতেই যেতে হবে : আল্লাহ তাআলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আবার তাকে মাটিতেই ফিরে যেতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আবার কবরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ‘আমি তো মানুষকে মৃত্তিকার মূল উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১২)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ - ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ ‘অতঃপর আমি ওকে শুক্ররূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে এবং রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি হাড়সমূহে, অতঃপর হাড়সমূহকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৩-১৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ ‘সেদিন নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিকটতম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফের বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! *(আন-নাবা, ৭৮/৪০)*। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, ইসলামের উপর, ঈমানের উপর অটল থাকা, যাতে করে পরকালীন জীবন সুখময় হয়। কারণ ইসলাম ব্যতীত সকল দ্বীন বাতিল। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ‘আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আলে-ইমরান, ৩/৮৫)*। অতএব হে কাফের! ইসলামের ছায়াতলে এসো, নইলে নাজাত পাবে না।

হে মানুষ! কবরে তোমাকে যেতেই হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ‘অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন’ *(আবাসা, ৮০/২১)*। হে মানবজাতি! একবার চোখ বন্ধ করে দেখো। হে মানব জাতি! রাতের অন্ধকারে, গভীর রাতে কবরস্থানে যাও, কেমন মনে হবে? তুমি দুনিয়াতে একাই এসেছ আবার তোমাকে একাই যেতে হবে। অন্ধকার কবরে তোমার কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। শুধু তোমার আমলগুলো থাকবে। হাদীছে আছে, ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়। দুটি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার আমল। তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়’।[১]

উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এমন কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্মরণ করেন, অথচ কাঁদেন না, আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পরকালে (বিপজ্জনক) স্থানসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থানগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে পরের সব স্থানগুলো আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে’। অতঃপর তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এটাও বলেছেন যে, ‘আমি এমন কোনো ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা কবরের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে’।[২] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, সা‘দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃত্যুবরণ করলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সা‘দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তার জানাযাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল’।[৩]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আপনার নিকট সর্বোচ্চ জান্নাত তথা জান্নাতুল ফেরদাউস পাওয়ার আশা করছি এবং বিনা হিসাবে জান্নাত পাওয়ার আশা করছি। আমীন!

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬০।

২. তিরমিযী, হা/২৩০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/১৩২।

৩. নাসাঈ, হা/২০৫৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/১৩৬।

www.al-itisam.com

বায়তুল মাক্বদিসের ফযীলত ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

-আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী*

নাম, উৎপত্তি ও ইতিহাস :

মাসজিদুল আক্বছা মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। মুসলিমদের প্রথম ক্বেবলা। হাজারো নবী-রাসূল আলাইহিস সালাম-এর আগমনের পুণ্যভূমি। সকল মুসলিমের প্রাণের কেন্দ্রস্থল বায়তুল মাক্বদিস। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

মাসজিদুল আক্বছা অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাসজিদে হারাম'। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, 'মাসজিদে আক্বছা'। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরির) মাঝে কত বছর ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, '৪০ বছর'।[১]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আদম আলাইহিস সালাম কা'বাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর মাসজিদুল আক্বছা তৈরি করেন। অথবা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বাঘর পুনঃসংস্কারের ৪০ বছর পর মাসজিদুল আক্বছা তৈরি করেন।[২]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পুত্র ইসহাক্ব আলাইহিস সালাম এখানেই বসবাস করতেন। পরবর্তীতে ইসহাক্ব আলাইহিস সালাম-এর পুত্র ইয়াকূব আলাইহিস সালাম ও তাঁর ১২ পুত্র বসবাস করতেন। অতঃপর তাঁর ১২ সন্তান থেকে ১২টি গোত্রের আবির্ভাব ঘটে, তারা সকলেই বানী ইসরাঈল তথা ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর সন্তান। উল্লেখ্য, নবী ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর নামই হচ্ছে ইসরাঈল।

অতঃপর নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম মাসজিদুল আক্বছা পুনঃসংস্কার করেন খ্রিষ্টপূর্ব ১০০৪ সালে। অনেকে মনে করেন সুলায়মান আলাইহিস সালাম প্রথম মাসজিদুল আক্বছা তৈরি করেছেন, কিন্তু এটা ভুল তথ্য। কারণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর মাঝে প্রায় ১০০০ বছর পার্থক্য।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সুলায়মান ইবনু দাঊদ আলাইহিস সালাম যখন বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন, তা হলো— তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এমন ফয়সালা যা তাঁর ফয়সালার মোতাবেক হয়। তা তাকে প্রদান করা হলো। তিনি আল্লাহর নিকট চাইলেন এমন বিশাল রাজ্য, যার অধিকারী তার পরবর্তী আর কেউ হবে না। তাও তাঁকে দেওয়া হলো। আর যখন তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে শুধু ছালাতের জন্য আগমন করবে, তাকে যেন পাপমুক্ত করে ঐ দিনের মতো করে দেন, যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল'।[৩]

নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বানী ইসরাঈল তথা ইয়াহূদীদের মধ্যে বিচ্যুতি এবং তাদের হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভক্তি দেখা দেয়। তাছাড়া তারা অগণিত নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের কাছে প্রেরিত অসংখ্য নবী-রাসূলকে তারা হত্যা করে। দাঊদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম ১০১০-৯৩১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বায়তুল মাক্বদিস শাসন করেছেন। সুলায়মান আলাইহিস সালাম খ্রিষ্টপূর্ব ৯৩১ সালে ইন্তেকাল করেন।

বর্তমান বিকৃত তাওরাতের রাজন্যবর্গ ও শাসকদের প্রথম পুস্তিকায় সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে এভাবে যে, তিনি মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী বর্জন করে মূর্তিপূজা করতেন (নাঊযুবিল্লাহ)।[৪]

আর একারণেই ইয়াহূদীরা আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং বায়তুল মাক্বদিসের মতো পবিত্র ভূমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়। নিম্নে বায়তুল মাক্বদিস ও ইয়াহূদীদের উপর বিভিন্ন জাতির আধিপত্যের ইতিহাস তুলে ধরা হলো।-

১. আরামীয়দের আধিপত্য : নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর কিছুদিন পর (খ্রিষ্টপূর্ব ৮৭৪ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮৫৩ সালের মধ্যে) আরামীয় সেনাবাহিনী বায়তুল মাক্বদিসে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সেখানকার সকল ইয়াহূদী নেতাকে হত্যা করে সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে।[৫]

২. আশুরীয়দের আধিপত্য : ৮৫৯-৮২৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইয়াহূদীদের উপর আশুরীয়দের আধিপত্যের সূত্রপাত ঘটে।

৩. ব্যাবেলীয়দের আধিপত্য : বাদশাহ বুখতে নাছর, যিনি শাম ও ফিলিস্তীনকে নিজ শাসনাধীনে আনার জন্য খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালে প্রথমবার এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে দ্বিতীয়বার সেখানে আক্রমণ করেছিলেন। বিপুল সংখ্যক ইয়াহূদীদের হত্যা করেন এবং বন্দিদেরকে বাবেলের (ব্যাবিলনের) খাবূর নদীর কাছে নাইবূর এলাকায় নির্বাসিত করেন।[৬]

---

* পি.এইচ.ডি গবেষক, কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সঊদী আরব।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬৬।

২. তাফসীরে কুরতুবী, ৪/১৩৮; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, (নবীদের ঘটনা), ৬/৪০০-৪১০।

৩. নাসাঈ, হা/৬৯৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৮, হাদীছটি ছহীহ।

৪. রাজন্যবর্গ ও শাসকদের ১ম পুস্তিকা, ইসসাহ, ১১ : ১-২ ।

৫. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২৪ : ৩ এবং অধ্যায় ১২ : ১৭-১৮ ।

৬. প্রাগুক্ত, অধ্যায় ২৪ : ১-৬।

৪. ইরানীদের আধিপত্য : পারস্য-সম্রাট সাইরাস বাবেল নগরী ও রাজ্য দখল করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে, বুখতে নাছরের বন্দিদেরকে এবং যেসব ইয়াহূদী বাবেলে বসবাস করত, তাদেরকে আল-কুদসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং তাদের উপাসনালয় সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করার অনুমতি দেন। তিনিই প্রথম ইরানী শাসক, যে কি-না ইয়াহূদীদের লালনপালন করেন।[৭]

৫. গ্রীকদের আধিপত্য : গ্রীক সম্রাট ইস্কান্দার আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ সালে মিশর, শাম ও ফিলিস্তীনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ইরানীদের উৎখাত করেন। এতে ইয়াহূদীরাও গ্রীকদের অধীনে চলে আসে।[৮]

৬. রোমকদের আধিপত্য : রোম সম্রাট বোম্বেই খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে সিরিয়া দখল করেন।[৯] পরের বছর তিনি আল-কুদস দখল করেন। ইঞ্জীলসমূহের বিবরণ অনুসারে রোম সম্রাট দ্বিতীয় হেরোডিস খ্রিষ্টপূর্ব ৪ সাল থেকে ৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াহূদীদের শাসন করেন এবং তার যুগেই ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।[১০]

৭. রোমান সম্রাট তিতুস এর আধিপত্য : রোমান সম্রাট তিতুস ৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল-কুদসে আক্রমণ করে সেখানকার হাজার হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করেন। ঠিক এসময় ইয়াহূদীরা মদীনায় হিজরত করে।[১১]

৮. রোমান সম্রাট হাদরিয়ান এর আধিপত্য : রোমান সম্রাট হাদরিয়ান ১৩২ থেকে ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল মাক্বদিস থেকে ইয়াহূদীদের উচ্ছেদ করেন।[১২] সবশেষে আবার রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইয়াহূদীদেরকে শাস্তি দেন এবং আল-কুদসে যে ইয়াহূদী ছিল, তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। আর এভাবে খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে এ শহর ইয়াহূদীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

ইয়াহূদী জাতি নিজেদের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত জাতি হিসাবে গণ্য করে। নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, অন্যান্য জাতিকে হীন, এমনকি চতুষ্পদ জন্তু বলে গণ্য করে। অথচ তাদের মধ্যে জগতের সকল নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্যকলাপ বিদ্যমান। তারা সেই আদিকাল থেকেই পৃথিবীর বুকে নানান অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ বাধাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইয়াহূদী এমন একটি জাতি, যাদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুসংখ্যক নবী ও রাসূল হত্যার ইতিহাস। তারা নবী ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করেছে, নবী যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-কে করাত দিয়ে চিরে দুই টুকরা করে ফেলেছে। ঈসা আলাইহিস সালাম-কেও হত্যার দাবি করেছিল। ইয়াহূদীরা পবিত্র ও সচ্চরিত্রা নারী মারইয়াম (আ.)-এর ওপর ব্যভিচারের জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছিল।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইয়াহূদীরা আল্লাহর নানাবিধ নাফরমানী ও নবী-রাসূলদের হত্যা করার কারণে তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হয়েছিল। যার কারণে তারা আর তাদের বসতবাড়ি এবং বায়তুল মাক্বদিস ফিরে পায়নি।

ইসলামী যুগ : শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের এক বছর পূর্বে রাতের বেলায় মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায় সফর করেন, যাকে ইসরা বলা হয়। অতঃপর সেখানে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল নবী-রাসূলদের নিয়ে ইমামতি করে ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন, যাকে মে'রাজ বলা হয়।[১৩] বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের প্রথম ক্বেবলা ছিল, যা থেকে হিজরতের ১৭ মাস পর কা'বার দিকে ক্বেবলা পরিবর্তন হয়।[১৪]

খুলাফায়ে রাশেদার যুগ : দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হিজরী ১৮ সালে যখন আল-কুদস ও ফিলিস্তীন জয় করেন, তখন খ্রিষ্টানরা খলীফার কাছে শর্তারোপ করেছিল যে, কোনো ইয়াহূদী যেন সেখানে বসবাস না করে এবং তিনিও তাদের ইচ্ছার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং এ বিষয়টি তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। তখন থেকে ১৩৪৩ হিজরী অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের হাতে তুর্কী উছমানী খিলাফতের পতন না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল মাক্বদিস ইয়াহূদীমুক্ত ছিল। প্রায় দেড় হাজার বছর ইয়াহূদীরা বায়তুল মাক্বদিসে বসবাসের সুযোগ পায়নি। উল্লেখ্য, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যুগে ১৮ থেকে ৪০ হিজরী পর্যন্ত মোট ২২ বছর বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের অন্যতম প্রদেশ ছিল *(আল-হামদুলিল্লাহ)*।

উমাইয়া (৪১-১৩২ হিজরী) শাসনামলের ৯০ বছর : এই ৯০ বছর পুরোটা সময় জুড়েই বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের হাতে ছিল। উমাইয়া শাসনামলে বায়তুল মাক্বদিসে উল্লেখযোগ্য কর্ম হলো বর্তমান স্থাপনাটি, যা উমাইয়া যুগে তৈরি। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি কুব্বাতুছ ছখরা নির্মাণ করেন।[১৫]

---

৭. আযরার পুস্তিকা, অধ্যায় ৬ : ৩-৭, অধ্যায় ১ : ৭-১১ ।

৮. দানিয়ালের পুস্তিকা, অধ্যায় ১১ : ৫।

৯. মথির ইঞ্জীল, পৃ. ২।

১০. মারকোসের ইঞ্জীল, ৬ : ১৬-২৮।

১১. আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়া আছ-ছহীহা, ১/২২৭।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. সূরা আল-ইসরা, ১৭/১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪. আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়াহ আছ-ছহীহা, ১/২৫৭।

১৫. আল-আনিসুল জালীল বি তারীখিল কুদুস, ১/২৭২-২৭৫।

আব্বাসীয় (১৩২-৬৫৬ হিজরী) শাসনামলের ৫২৪ বছর : আব্বাসীয় শাসনামলের ৫২৪ বছরের মধ্য ৩৬০ বছর বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের দখলেই ছিল। অতঃপর আব্বাসীয় শাসনামলের শেষের দিকে ৪৯২ হিজরী মোতাবেক ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা বায়তুল মাক্বদিস দখল করে নেয় এবং হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। আর এর পিছনে তৎকালীন মিথ্যা ফাতেমী দাবিদার মিশরের শীআ শাসকগোষ্ঠী ক্রুসেডারদের আহ্বান করে এবং ফিলিস্তীন দখলের আমন্ত্রণ জানায়। এর ফলে অতি সহজেই খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা বায়তুল মাক্বদিস দখল করে নেয়।

মুসলিম বীর গাজী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ ভালোভাবেই শীআদের নেফাক্বী আর সুন্নীদের হত্যার ইতিহাস জানতেন। তাই তিনি দেখলেন বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধার করতে হলে আগে শীআদের উচ্ছেদ করতে হবে। কারণ তারাই ক্রুসেডারদের উৎসাহ প্রদান করছে। অবশেষে ৫৬৭ হিজরী মোতাবেক ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের মাটি থেকে তিনি শীআদের উৎখাত করেন। অতঃপর ৫৮৩ হিজরী মোতাবেক ১১৮৭ সালে মুসলিম বীর সিপাহসালার সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ হিত্তীন প্রান্তরে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে পুনরায় জেরুজালেম শহর ও বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের অধিকারে নিয়ে আসেন *(আলহামদুলিল্লাহ)*।[১৬]

মামলূকী (৬৪৮-৯২৩ হিজরী) শাসনামলের ২৭৫ বছর : এই ২৭৫ বছর পুরোটাই বায়তুল মাক্বদিস সুন্নী মামলূকী মুসলিমদের হাতেই ছিল, যদিও তারা খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের সঙ্গে জিহাদরত অবস্থায় ছিলেন।[১৭]

উছমানীয় (৯২৩-১৩৪৪ হিজরী) শাসনামলের ৪০০ বছর : এই ৪০০ বছর প্রায় পুরোটাই বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের দখলে ছিল। অটোমান বা উছমানীয় শাসনের শেষদিকে ১৯১৭ সালে ইংরেজরা ফিলিস্তীনে অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াহূদীরা ফিলিস্তীনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিতে ইয়াহূদী সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দাঙ্গা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। এসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ফিলিস্তীন ভূমিকে মুসলিম ও ইয়াহূদীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ফলে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে জায়ানিস্ট অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র ইসরাঈল ১৯৬৭ সালে মাসজিদুল আক্বছা জবরদখল করে নেয় এবং জায়ানিস্ট ইসরাঈল একের পর এক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দখল করে ইয়াহূদী বসতি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে। বর্তমানে তারা সাধারণ ফিলিস্তীনীদের হত্যা, গুম, অপহরণ, গণগ্রেফতার চালিয়েই যাচ্ছে। হে আল্লাহ! তুমি ইয়াহূদীদের ধ্বংস করো এবং ফিলিস্তীন ও বায়তুল মাক্বদিস মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দাও।

বায়তুল মাক্বদিসের ফযীলত :

১. ইসলামের প্রথম ক্বেবলা। ইসলামী শরীআতে সফর করা যায় এমন তিনটি মসজিদের একটি হলো বায়তুল মাক্বদিস।[১৮]

২. বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায় করলে ৫০০ গুণ বেশি ছওয়াব হয়।[১৯]

৩. প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মে'রাজ গমনের সময় তিনি এই মসজিদে সকল নবী–রাসূলের ইমামতি করে ছালাত আদায় করেন।[২০]

৪. অসংখ্য নবী–রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত অহী অবতরণের স্থান।

৫. এখানেই হাশর-নাশর হবে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন ও ইয়াহূদীদের হত্যা করবেন।[২১]

বায়তুল মাক্বদিস ফিরে পেতে আমাদের করণীয় :

১. মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিশেষ করে ফিলিস্তীনী ভাইদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

২. কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে এবং সালাফদের মানহাজ অনুযায়ী চলতে হবে। শীআদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. শক্তি অর্জন করতে হবে। পূর্ণশক্তি কিংবা শত্রুর মোকাবিলা করার মতো শক্তি হলে শারঈ জিহাদের নীতিমালা অনুযায়ী শারঈ আমীরের নেতৃত্বে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধার করার চেষ্টায় ঝাপিয়ে পড়লে ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদের হবেই।

৪. বেশি বেশি করে দু'আ করা, বিশেষ করে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করা।

আল্লাহ মুসলিমদের পবিত্র স্থান বায়তুল মাক্বদিস শত্রুমুক্ত করুন। আমীন!

---

১৬. ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত-তারীখ, ১০/৩৭; ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ওয়াল কাযাউ আলাল ফাতেমিইয়্যীন, পৃ. ১৬৩-২০৩।

১৭. আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনু আলী, মুখতাছার ফী আখবারিল বাশার, বিস্তারিত ৩য় খণ্ড।

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৯, ৪৪৯২।

১৯. বায়হাক্বী, হা/১৭৭৩; আল-জামে আছ-ছহীহ, হা/৪২১১, হাদীছ হাসান। অনেকে উক্ত হাদীছের সনদকে দুর্বল বলেছেন।

২০. সূরা আল-ইসরা, ১৭/১-এর ব্যাখ্যা, তাফসীরে ইবনু কাছীর।

২১. মুসনাদে বাযযার, হা/৩৯৬; আল-জামে আছ-ছহীহ, হা/৩৭২৬, হাদীছ ছহীহ।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১২তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১৯তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 17] قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة : 18] قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة : 19] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

অনুবাদ :

মহান আল্লাহর বাণী, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অহি নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর ঠোঁট (দ্রুত) নাড়াতেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঠোঁট নাড়াতেন’।

সাঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর ছাত্রদের বললেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে আমার ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি যেভাবে আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁর ঠোঁট নাড়াতে দেখেছি। অতঃপর তিনি তাঁর ঠোঁট নেড়ে দেখান। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’। এর সংগ্রহ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬-১৮)।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এর অর্থ হলো আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। আল্লাহর বাণী, ‘সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। আল্লাহর বাণী, ‘এরপর আপনার কাছে তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমারই’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)। অর্থাৎ অতঃপর আপনাকে পাঠ করানোর দায়িত্বও আমারই। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন এবং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঠিক সেভাবে পড়তেন, যেভাবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) পড়েছিলেন’।]

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

বুখারীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে হাদীছের ইবারতের ভিন্নতা :

(১) আবুল ওয়াকত থেকে সাম‘আনী যে বর্ণনা করেছেন, তাতে حدثنا এর পরিবর্তে أخبَرَنا শব্দ আছে।

(২) আছীলী ও আবূ যারের বর্ণনাতে تَعالَى এর পরিবর্তে عَزَّ وَجَلَّ শব্দ আছে।

(৩) আছীলী, ইবনু আসাকিরের বর্ণনাতে এবং আবুল ওয়াকত থেকে সাম‘আনী যে বর্ণনা করেছেন তাতে لَكُمْ এর পরিবর্তে لك শব্দ আছে।

(৪) কারীমার বর্ণনাতে جَمْعُه لك في صدرك আছে। অর্থাৎ لَهُ এর বদলে لك আছে। আবূ যার ও ইবনু আসাকিরের একটি বর্ণনাতে এবং আবুল ওয়াকত থেকে সাম‘আনী যে বর্ণনা করেছেন সেই বর্ণনার একটিতে جَمْعُه له صدرُك আছে। অর্থাৎ সেখানে في শব্দ নেই। আর আবূ যার, ইবনু আসাকির, আছীলীর আরেকটি বর্ণনাতে এবং আবুল ওয়াকত থেকে সাম‘আনী যে বর্ণনা করেছেন সেই বর্ণনার আরেকটিতে جَمْعُه لك صدرُك আছে। অর্থাৎ সেখানে لَهُ এর বদলে لك আছে। আবার في শব্দও নেই।

(৫) আবুল ওয়াকত থেকে সাম‘আনী যে বর্ণনা করেছেন তাতে قال শব্দ নেই।

(৬) আবূ যার, আছীলী ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনাতে كما قَرَاهُ এর বদলে كما قرأ আছে। আর কুশমাইহানীর বর্ণনাতে এবং আবূ যারের আরেকটি বর্ণনাতে كما كان قرأ আছে।

হাদীছের তাখরীজ :

ইমাম আহমাদ হাদীছটি শুনেছেন আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী থেকে। ইমাম বুখারী,[১] মুসলিম[২] ও নাসাঈ[৩] হাদীছটি শুনেছেন কুতায়বা ইবনু সাঈদ থেকে। ইমাম বুখারী হাদীছটি আরো শুনেছেন মূসা ইবনু ইসমাঈল আত-তাবুযাকী থেকে। তারা সকলেই (ইবনু মাহদী, কুতায়বা, মূসা) এবং ইমাম আবূ দাঊদ তয়ালিসী (হা/২৭৫০) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানা অযযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইয়াশকুরী থেকে। ইমাম বুখারী হাদীছটি আরো শুনেছেন হুমায়দী থেকে। ইমাম তিরমিযী[৪] হাদীছটি শুনেছেন ইবনু আবী উমার আল-আদানী

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫, ৪৯২৭, ৪৯২৮, ৪৯২৯, ৫০৪৪, ৭৫২৪।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪৮।
৩. নাসাঈ কুবরা, হা/১০০৯, ৭৯২৪, ১১৫৭০, ১১৫৭১, ১১৫৭২।
৪. তিরমিযী, হা/৩৩২৯।

www.al-itisam.com

থেকে। তারা উভয়ে (হুমায়দী ও আদানী) এবং ইমাম আহমাদ[৫] হাদীছটি শুনেছেন সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে। ইমাম মুসলিম হাদীছটি আরো শুনেছেন ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ ও ইবনু আবী শায়বা থেকে। তারা উভয়ে জারীর ইবনে আব্দুল হামিদ আয-যব্বী থেকে। ইমাম বুখারী হাদীছটি আরো শুনেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা থেকে, তিনি ইসরাঈল ইবনু ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক্ব আস-সাবেঈ থেকে।

উপরে উল্লেখিত সকলেই (আবূ আওয়ানা, সুফিয়ান, জারীর, ইসরাঈল) সকলেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনু আবী আয়েশা থেকে। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম বাযযার[৬] দুটি আলাদা সূত্রে হাদীছটি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনু দীনার আল-আছরাম থেকে। ইমাম নাসাঈ হাদীছটি আরো বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল ইবনু ইউনুস ইবনে আবী ইসহাক্ব আস-সাবেঈর সূত্রে, তিনি তার দাদা আবূ ইসহাক্ব আস-সাবেঈ থেকে। তারা সকলেই (মূসা, আবূ ইসহাক্ব আস-সাবেঈ, আমর ইবনু দীনার) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে।

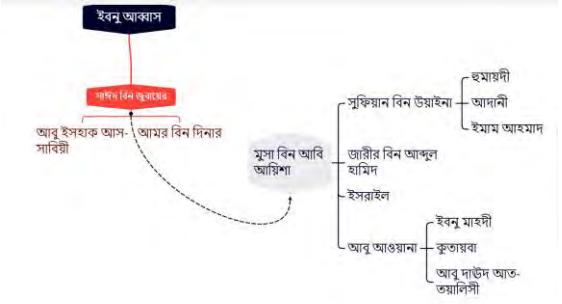

শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ :

يُعَالِجُ মূল অর্থ চিকিৎসা করা। তবে কষ্ট সহ্য করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উক্ত হাদীছে কষ্ট সহ্য করা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ এই বাক্যে مِمَّا (মিম্মা) শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম সারকুসতী বলেন, এখানে 'মিম্মা' দ্বারা উদ্দেশ্য كثيرا ما তথা তিনি অধিকাংশ সময় ঠোঁট নাড়াতেন। আর একদল বলেছেন, এখানে 'মিম্মা' দ্বারা ربما উদ্দেশ্য। যা স্বল্পতা ও অত্যধিক উভয়ের জন্যই আরবী ভাষাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বল্পতা ধরলে অর্থ হবে তিনি অল্পই তার ঠোঁট নাড়াতেন। আরেক দল বলেছেন, كان এর গোপন সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বের মু'আলাজা আর ما মাছদারিয়া আর من সাবাবিয়া। তখন অর্থ দাঁড়াবে- كان علاجه ناشئا من تحريك شفتيه অর্থাৎ 'তার এই কষ্টের কারণ হচ্ছে তার ঠোঁট নাড়ানো।

কুরআনে জিহ্বা, হাদীছে ঠোঁট কেন?

উক্ত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মতো করে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঠোঁট নাড়িয়ে দেখিয়েছেন। হাদীছের সারমর্ম হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে এই ঠোঁট নাড়ানো থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতে ঠোঁট নাড়ানোর কোনো কথা নেই। বরং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জিহ্বা নাড়াতে নিষেধ করেছেন। তাহলে কুরআনে জিহ্বা নাড়াতে নিষেধ করা হচ্ছে আর হাদীছে সেটা দেখানো হচ্ছে ঠোঁট নাড়ানোর মাধ্যমে। এই বৈপরীত্যের কারণ ও সমাধান মুহাদ্দিছগণ বিভিন্নভাবে করেছেন। নিম্নে দু'টি প্রাধান্যযোগ্য জবাব প্রদান করা হলো—

(১) হাদীছের অন্য রেওয়ায়েতে অন্য রাবীগণ যখন হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখন তারা জিহ্বা ও ঠোঁট উভয়টির কথাই বলেছেন। মূসা ইবনু আবী আয়েশার দুই জন ছাত্র আবূ আওয়ানা ও ইসরায়েল শুধু ঠোঁট বর্ণনা করেছেন।[৭] তার আরেকজন ছাত্র সুফিয়ান শুধু জিহ্বার কথা বর্ণনা করেছেন।[৮] আরেকজন ছাত্র জারীর জিহ্বা ও ঠোঁট উভয়ের কথাই বর্ণনা করেছেন।[৯]

(২) আরবীর সকল বর্ণ শুধু ঠোঁট বা শুধু জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তথা আরবী সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে ঠোঁট ও জিহ্বা উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং একটা আরেকটার পরিপূরক। তাই একটা উল্লেখ করা মানে আরেকটা বাদ দেওয়া, তা নয়। বরং ওই একটার মাধ্যমে উচ্চারণ করতে যা যা লাগে তার সবকিছু বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ 'আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের যা গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতকে পূর্ণ করবেন, যাতে তোমরা অনুগত হও' *(আন-নাহল, ১৬/৮১)*।

৫. আহমাদ, হা/১৯৩৫।
৬. বাযযার, হা/৪৯৭৬, ৪৯৭৭।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫২৪।
৮. তিরমিযী, হা/৩৩২৯।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২৯, ৫০৪৪।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শুধু গরমের কথা বলেছেন। ঠাণ্ডার কথা বলেননি। তার মানে ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কাপড় সাহায্য করবে না, তা নয়। কিন্তু একটা উল্লেখ করার মাধ্যমে ওই জাতীয় যে ধরনের প্রয়োজনে কাপড় কাজে আসে তার সবগুলোই উদ্দেশ্য।

আয়াতসমূহের তাফসীর :

উক্ত আয়াতের যে তাফসীর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে উক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে—

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ এই আয়াতে 'কুরআনাহু' দ্বারা পড়তে পারার সক্ষমতা প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ আবার এই আয়াতেও 'বায়ানাহু' দ্বারা পড়তে পারার সক্ষমতা প্রদানকে বুঝানো হয়েছে।

আয়াত ভিন্ন, শব্দ ভিন্ন কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা উক্ত হাদীছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করলেন একই রকম। আর আমরা জানি যে, কুরআনে অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা নেই। মহান আল্লাহ একই কথা এভাবে দুইবার বলার কথা নয়। এই সমস্যার সমাধান বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে।

(ক) প্রথমবার পড়ার সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য নিজে পড়তে পারার সক্ষমতা। আর পরেরবার পড়ার সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য জনগণের সামনে পড়তে পারার সক্ষমতা।

(খ) প্রথমবার পড়ার সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমবারের মতো পড়তে পারার সক্ষমতা। আর পরেরবার পড়ার সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য পরবর্তীতে বারবার পড়তে পারার সক্ষমতা।

(গ) সবচেয়ে সঠিক উত্তর হচ্ছে— আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, উপরিউক্ত তাফসীরটির অন্যান্য সনদে যেভাবে ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনাটিই বেশি প্রণিধানযোগ্য। যেমন— ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুত তাফসীরে উল্লেখ করেছেন,

{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ}] القيامة [١٧ :وَقُرْآنَهُ، أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ، أَنْ تَقْرَأَهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ}] القيامة [١٨ :يَقُولُ: أَنْزِلَ عَلَيْهِ: {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}] القيامة [١٩ :أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

সারমর্ম : প্রথম 'কুরআনাহু' দ্বারা উদ্দেশ্য পড়তে পারার সক্ষমতা আর পরবর্তীতে 'বায়ানাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য তাফসীর বা ব্যাখ্যা করতে পারার সক্ষমতা।[১০]

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তাফসীরটি মূসা ইবনু আবী আয়েশার ছাত্র আবূ আওয়ানা বর্ণনা করেছেন। আর 'বায়ানাহু' দ্বারা ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য মর্মে বর্ণিত বর্ণনাটি মূসা ইবনু আবী আয়েশার ছাত্র ইসরাঈল ও জারীর বর্ণনা করেছে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিছ ছওয়াব।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২৮।

আয়াতের আগে পরের সাথে সম্পর্ক : আয়াতের আগে ও পরে ক্বিয়ামতের আলোচনা তার মাঝে মাত্র কয়েকটি আয়াতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই ধরনের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের আলোচনার মধ্যে কুরআনকেন্দ্রিক এই কয়েকটি আয়াত আনার কী কারণ বা এই আয়াতগুলোর সাথে তার আগের ও পরের ক্বিয়ামতসংক্রান্ত আয়াতের কী সম্পর্ক?

আমাদের মনে রাখতে হবে পবিত্র কুরআনে কোনো কিছুই একসাথে একত্রে এক জায়গায় উল্লিখিত হয়নি। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম -এর জীবনী পরিপূর্ণরূপে এক জায়গায় একসাথে উল্লেখ করা হয়নি। ঠিক তেমনি জান্নাতের বিবরণ বা জাহান্নামের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে আলাদাভাবে একত্রে কোথাও বর্ণিত হয়নি। বরং যখন যেখানে যেভাবে প্রয়োজন মনে হয়েছে তখন সেখানে ততটুকু তিনি উল্লেখ করেছেন। যেহেতু কুরআন কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় সেহেতু সকল নবীর বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ করা হয়নি। বরং কুরআন যেহেতু উপদেশের বই, সেহেতু যে নবীর জীবনীর যে অংশ দিয়ে পবিত্র কুরআনের যেখানে যে ধরনের উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে সেই বিশেষ অংশটুকু উল্লেখ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে তার আগের ও পরের আয়াতের সম্পর্ক থাকবে বিষয়টি এমন নয়। আর এই বিভিন্নতাই আমাদের পৃথিবীর মৌলিক সৌন্দর্য। যদি মহান আল্লাহ সব নদীগুলো এক জায়গায় দিয়ে দিতেন, সব সমুদ্র এক জায়গায় দিয়ে দিতেন, সব পাহাড় এক জায়গায় দিয়ে দিতেন, এভাবে ভাগ ভাগ করে সাজাতেন, তাহলে পৃথিবীর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত। এজন্য বিচ্ছিন্নভাবে যখন যেখানে নদীর দরকার সেখানে নদী রয়েছে আবার নদীর পাশেই পাহাড় রয়েছে আবার মরুভূমির পাশেই সবুজ রয়েছে, বরফাচ্ছাদিত শহরের পাশেই তপ্ত লু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা বিষয়টি বুঝার জন্য আমাদের বাস্তব জীবন থেকে আরো একটি উদাহরণ দেখতে পারি—

যখন আমাদের কারো পিতা তার সন্তানকে প্রথম প্রথম উপদেশ দেয়, তখন তিনি তাকে সকল উপদেশ একসাথে প্রদান করেন না, বরং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করেন। যেমন যখন তিনি দেখেন তার সন্তান খাচ্ছে তখন তাকে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। আবার যখন দেখেন কারো সাথে সময় নষ্ট করছে, তখন সময়ের মূল্যের উপদেশ প্রদান করেন। আবার যখন দেখেন মোবাইলে গেম খেলছে, তখন মোবাইল আসক্তির বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআনের মূল সৌন্দর্য হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশের বিন্যাস।

একই উপদেশ এমনভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বারবার বলা হয়েছে, যাতে সবসময়ই সেই উপদেশটি নতুন আঙ্গিকে নতুন অর্থ বহন করে। মূলকথা একই হলেও প্রাসঙ্গিকতা ভিন্ন হওয়ার কারণে তার অনুভূতি ও স্বাদও ভিন্ন হয় আর এটাই কুরআনের মু'জেযা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলো ক্বিয়ামতের আলোচনার মধ্যে বর্ণিত হওয়ায় কুরআনের জন্য দোষ-ত্রুটির কিছু নয়।

তারপরও মুফাসসিরগণ প্রত্যেক আয়াতের সাথে তার আগের ও পরের আয়াতের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। উক্ত আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত কয়েকটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করা হলো—

(ক) মূলত সূরা আল-ক্বিয়ামাহ অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূল ﷺ জিহ্বা ও ঠোঁট তাড়াহুড়ো করে নাড়াচ্ছিলেন। তাই তখনই তাকে সতর্কতার উদ্দেশ্যে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করা হয়। যেমন ইবনু আশুর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَيَكُونُ وُقُوعُ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِثْلَ وُقُوعِ وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ [٦٤] ، وَوُقُوعُ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى فِي أَثْنَاءِ أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَة . [٢٣٨] قَالُوا: نزلت هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَثْنَاءِ سُورَةِ الْقِيَامَةِ: هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَيِمَّةِ التَّفْسِيرِ.

'এই আয়াতগুলোর সূরা ক্বিয়ামার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ঠিক তেমন, যেমনটি সূরা মারইয়ামের মধ্যে এই আয়াতটি ﴿وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ 'বলে দাও, হে জিবরীল! আমি একমাত্র আপনার প্রতিপালকের নির্দেশেই কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হই' *(মারইয়াম, ১৯/৬৪)*। অনুরূপই সূরা আল-বাক্বারায় স্ত্রীগণের হুকুম-আহকাম বর্ণনার মাঝে এই আয়াতের উল্লেখ ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾ 'তোমরা ছালাতসমূহকে সংরক্ষণ করো! বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতকে' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)*। সকল মুহাদ্দিছ ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, এই আয়াতগুলো সূরা আল-ক্বিয়ামাহ অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে'।[১১]

ইবনু আশুর রহিমাহুল্লাহ-এর উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা : সূরা মারইয়ামে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলে দাও, হে জিবরীল! আমি একমাত্র আপনার প্রতিপালকের নির্দেশেই কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হই' *(মারইয়াম, ১৯/৬৪)*। এই আয়াতের আগে পরে সূরা মারইয়ামে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়ের আলোচনা আছে, কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকদিন যাবৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আসেননি, তার সেই না আসার উত্তর মহান আল্লাহ এই আয়াতে দিয়েছেন। তথা আয়াত অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মনের মধ্যে উদিত প্রশ্নের উত্তর সেই অবস্থাতেই সাথে সাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা হয়তো যে বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিক এমনটিই ঘটেছে সূরা আল-ক্বিয়ামাহতে। ক্বিয়ামত বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়া অবস্থাতেই রাসূল ﷺ আয়াতগুলো মুখস্থ করার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করছিলেন তাই সেই অবস্থাতেই তাকে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

(খ) উক্ত আয়াতগুলোর সাথে তার পূর্বের অংশের সরাসরি কোনো মিল না থাকলেও আয়াতের পরের অংশের সাথে আয়াতগুলোর মিল রয়েছে। যেমন উক্ত আয়াতগুলোর শেষে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ - وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ 'কখনই নয়, তোমরা তাড়াহুড়ো পছন্দ করে থাকো এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ করে দাও' *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২০)*। তথা যেহেতু দুনিয়ার ফলাফল খুব দ্রুত পাওয়া যায়, কিন্তু পরকালের ফলাফল পেতে সময় লাগে; তাই মানুষ দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দেয়। কেননা মানুষ দ্রুততা ও তাড়াহুড়ো ভালোবাসে। যা চোখের সামনে দ্রুত পাওয়া সম্ভব সেটার পেছনেই মানুষ ছোটে।

আগের আয়াতে রাসূল ﷺ-কে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করার পরপরই সেই তাড়াহুড়োর সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিয়েই মহান আল্লাহ পুনরায় ক্বিয়ামতের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। যা এই আয়াতগুলোর সাথে পরের আয়াতগুলোর সম্পর্ক নিশ্চিত করেছে।

(চলবে)

১১. আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৯/৩৪৯।

আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাস

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

আল-কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একমাত্র সোপান এ গ্রন্থ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মানুষের সার্বিক কল্যাণে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

পরিচিতি : আল-কুরআন মানবীয় সকল কর্মকাণ্ডকে ঘিরে এক অনন্য জীবনবিধান। কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা আবুল বারাকাত রহিমাহুল্লাহ বলেন,

القرآن هو الكتاب المنزّل على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة لها

'আল-কুরআন হলো আসমানী কিতাব, যা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মুছহাফে লিখিত এবং সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে'।[১]

কুরআনের তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইনজ্ঞদের জন্য একটি বিশ্বকোষ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। আর এ কিতাবের সার্বিক সংরক্ষণের দায়িত্ব সর্বোপরি আল্লাহ নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী' *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন সংকলন : কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সংরক্ষণার্থে তা হিফয করার জন্য দ্রুত আবৃতি করতেন। যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ 'হে রাসূল! তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে দ্রুত সঞ্চালন করো না। তার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা (জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে) পাঠ করি, তুমি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করো। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই' *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬-১৯)*।

এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটে।

জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর তা'লীম : কুরআন সংরক্ষণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রামাযানে পূর্বে নাযিলকৃত অংশগুলো জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে পড়ে শোনাতেন। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের বছর তিনি দুবার সমস্ত কুরআন জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে শুনান এবং তার থেকেও নিজে শোনেন।[২]

লিখিত সংকলন : কুরআন এক সাথে নাযিল হয়নি বলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুঅতী জীবনে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। এ সময় কুরআনের যে অংশ যখনই নাযিল হতো, তখনই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী লেখকগণের দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন। নির্ধারিত অহী লেখকের দ্বারা লেখানোর ফলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লামা ক্বস্তলানী রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً - فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল যিনি পবিত্র ছহীফা পড়ে শুনাবেন। যাতে একেবারে সঠিক কথাগুলো লিখা আছে' *(আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮/২-৩)*।

ছাহাবীগণের হিফয প্রবণতা : ছাহাবীদের মাঝে হিফয করার প্রবণতাও তখন থেকে শুরু হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে

---

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. নাযরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাক্বির রসূলিল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৪/১১৮০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬২৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৫২৪।

www.al-itisam.com

সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়’।[৩]

এরপর থেকে ছাহাবীগণের মাঝে কুরআন হিফয করার বিষয়ে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মহিলা ছাহাবীগণ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফলে রাসূল ﷺ-এর নবুঅতী জীবনেই শত শত হাফেযে কুরআন তৈরি হয়। এমনকি বালকদের মাঝেও কুরআন হিফযের প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়।

আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যুগ : রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর খেলাফতকালে ৪ জন ভণ্ড নবীর উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে শক্তিশালী ‘মুসায়লামাতুল কাযযাব’-এর বিরুদ্ধে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ইয়ামামার যুদ্ধ। আল্লামা ত্বারী রাহিমাহুল্লাহ একে ‘হাদীক্বাকুল মাউত’ বা The battle of the garden of death বলেছেন।

এ যুদ্ধে বহু হাফেযে কুরআন শহীদ হলে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট কুরআনের কিয়দংশ বিস্মৃতির আশঙ্কা প্রকাশ করে কুরআনকে একসঙ্গে সংকলিত করার পরামর্শ দেন। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ যে কাজ করেননি, তা করতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সংকলনের সিদ্ধান্ত নেন।

যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে দায়িত্ব প্রদান : কুরআন সংকলনের ব্যাপারে নীতিগত ঐকমত্যের পর খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ সুমহান কাজটি করার জন্য যায়েদ ইবনু ছাবিত আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু কুরআন সংকলনের জন্য একদিকে প্রিয়নবী ﷺ-এর রেখে যাওয়া লিখিত অংশসমূহ এবং ছাহাবীগণের মধ্যে যার নিকট যতটুকু পাওয়া যায়, তা একত্রিত করলেন।

অপর দিকে কুরআনের হাফেযদের পূর্ণ সহায়তা নিলেন। এ তিন প্রকারের সম্মিলিত সাহায্যে ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যুগ : আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নির্দেশে সংকলিত নুসখা বা কপিটি তার নিকটেই সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এ নুসখা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ইন্তেকালের সময় নুসখাটি উম্মুল মুমিনীন হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট রেখে যান।

উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর যুগ : ইসলামের তৃতীয় খলীফা উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর আমলে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটলে অধিকৃত অঞ্চলের মুসলিমগণ কুরআন শিক্ষা শুরু করে। এ সময় ক্বেরাআতের বিভিন্নতার কারণে কুরআন পাঠে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ মতপার্থক্য নিরসন কল্পে তিনি একটি সর্বজনগ্রাহ্য নুসখা প্রণয়ন করেন।

উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট রক্ষিত আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক সংকলিত নুসখা চেয়ে আনেন এবং যায়েদ ইবনু ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আছ এবং আবদুর রহমান ইবনু হারেছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির উপর এর কয়েকটি অনুলিপি তৈরির দায়িত্ব প্রদান করেন। সাথে সাথে লিখার ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে কুরায়শী ক্বেরাআত গ্রহণ করেন। তারা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুসারে সাজান এবং নুক্বতা ও হরকত ছাড়াই লিখেন, যাতে সব ক্বেরাআতেই পড়া যায়। অতঃপর খলীফার নির্দেশে এ নুসখা ছাড়া অন্যান্য নুসখাসমূহকে একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে পঠিত কুরআন এ মুছহাফে উছমানেরই প্রতিলিপি। এর কোনোরূপ বিকৃতি বা বিচ্যুতি আজও পরিলক্ষিত হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। প্রকাশ থাকে যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর আমলে কুরআনে হরকত সংযোজন করা হয়।

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ, যা আজও পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর কোনো ধরনের বিকৃতি হবে না। কেননা এর হেফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে নিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী’ *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।

তাবীয ব্যবহার শিরক

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

ভারতীয় উপমহাদেশে তাবীয একটি পরিচিত শব্দ। সকল ধর্মাবলম্বীরাই তাবীয ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলামে তাবীয ব্যবহার করা হারাম ও শিরক। আজ আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানার চেষ্টা করব— তাবীয কীভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে শিরক করিয়ে মুশরিকে পরিণত করে। সেইসাথে বর্তমান যুগে তাবীযের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তাবীয কী?

সোজাকথায় তাবীয হচ্ছে এমন বস্তু যার ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা আছে মনে করে মানুষ তা শরীরে, বাহুতে, গলায় বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখে।

তাবীযের মূল উদ্দেশ্য :

আমাদের উপমহাদেশে তাবীয দেওয়া এবং নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, এই তাবীয তাকে গায়েবী খারাপ কোনো কিছু থেকে রক্ষা করবে। বিশেষ করে জিন-ভূতের আছর কিংবা কারো উপকার বা অপকার করার উদ্দেশ্যে তাবীয পরিধান করে।

তাবীয নিষিদ্ধের দলীল :

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি শক্তিশালী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, তাবীয ব্যবহার করা সরাসরি হারাম এবং শিরক। আবূ বাসীর আনছারী আব্বাদ ইবনু তামীম থেকে থেকে বর্ণিত, তিনি (আবূ বাসীর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো একা সফরে ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে কাজে পাঠালেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার বিশ্বাস যে, তখন সমস্ত লোক ঘুমিয়েছিল। কাজটি ছিল কোনো উটের গলায় কোনো হার, তাবীয কিংবা ঘণ্টা যেন না থাকে। থাকলে কেটে ফেলতে বলেন।[১] জাহেলী যুগে কুসংস্কারের কারণে উটের গলায় মালা লটকানো হতো যাতে উট বদনযর থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ভ্রান্ত ধারণা ও রসম উৎখাতের ব্যবস্থা করেন। উক্বা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না’।[২]

কোনো কিছুর দ্বারা তাবীয বা কড়ি ঝুলানো একই ধরনের অপরাধ। উক্বা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দলটির নয়জনকে বায়আত করালেন এবং একজনকে বায়আত করালেন না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নয়জনকে বায়আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল ﷺ বললেন, ‘তার সাথে একটি তাবীয রয়েছে। তখন লোকটি হাত ভেতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকেও বায়আত করালেন এবং বললেন, ‘যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল’।[৩]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, তাবীয ব্যবহার করা জঘন্য অপরাধ। এরূপ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়আত করানো থেকে বিরত থেকেছেন। সেটা যে প্রকারের তাবীয হোক না কেন। তাহলে তাবীযের অপরাধ কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

রুওয়াইফা ইবনু ছাবেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘হে রুওয়াইফা! হয়তো তুমি আমার পরও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে এ কথা বলে দিয়ো যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিল (জট পাকাল) অথবা তাবীয জাতীয় বেল্ট বা সূতা (ছেলে-মেয়ের বা প্রাণীর গলায়) পরাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতেঞ্জা করল, নিশ্চয়ই তার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো সম্পর্ক নেই’।[৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীয এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা শিরক’।[৫] এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাবীয ব্যবহার করা, বাচ্চাদের গলায় বা কোমরে কালো, সাদা, লাল যেকোনো কিছুই বাঁধা হোক না কেন তা শিরক।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, একদা (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘(তোমার গলায়) এটা কী? বললাম, এটা একটি তাগা, এতে আমার জন্য মন্ত্র পড়া হয়েছে। যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, তা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহর পরিবারবর্গ। তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী নও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও জাদুটোনা শিরকী কাজ’।[৬]

---

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১. মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৬৮৭; ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১১৫।

২. আহমাদ, হা/১৭৪৪০।

৩. আহমাদ, হা/১৭৪৫৮, সনদ ছহীহ।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৩৬; নাসাঈ, হা/৫০৬৭; মিশকাত, হা/৩৫১, সনদ ছহীহ।

৫. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৩০; আহমাদ, হা/৩৬১৫; মিশকাত, হা/৪৫৫২, সনদ ছহীহ।

৬. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৫; আহমাদ, হা/৩৬১৫; সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৪৫৫২।

উপরিউক্ত হাদীছসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার তাবীয ব্যবহার হারাম এবং শিরক।

ঝাড়ফুঁক জায়েয :

ইসলামে শরী'আতসম্মত ঝাড়ফুঁকের অনুমোদন অনুমোদন রয়েছে। আওফ ইবনু মালেক আশজাঈ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো। যেসব ঝাড়ফুঁকে শিরক নেই, তাতে কোনো দোষ নেই'।[৭]

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার (উম্মে সালমার) ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় (বদনযরের) চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, 'এর জন্য ঝাড়ফুঁক করো, কেননা তার উপর নযর লেগেছে'।[৮] সুতরাং বদনযর লাগলে তাকে ঝাড়ফুঁক করা যাবে।

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কারো উপর বদনযর লাগলে, কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁজরে খুজলি (পিঁপড়ার মতো ছোট ছোট জিনিস শরীরে বের হওয়া) উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন'।[৯] আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনছারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করার অনুমতি দেন'।[১০]

সুতরাং এছাড়াও অসংখ্য ছহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যেকোনো অসুস্থতা এবং বদনযর লাগা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝাড়ফুঁককে জায়েয করা হয়েছে।

ভরসা আল্লাহর উপর :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবীয এজন্যই নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা ভুলে তাবীযের উপর ভরসা না করে। কেননা যেকোনো বিপদ আপদ, দুঃখ-দুর্দশা সর্বাবস্থায় আমাদের আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ দান করেন, তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' *(আল-আনআম, ৬/১৭)*।

সুতরাং একমাত্র আল্লাহই মানুষকে কষ্ট দেন এবং তিনিই একমাত্র উদ্ধারকারী। যেসব কারণে তাবীয ব্যবহার হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে জিনের আছর এবং বদনযর। আর এই দুই রোগের চিকিৎসা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন ঝাড়ফুঁক ও নিয়মিত দু'আ-কালাম পড়ার মাধ্যমে। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ঝাড়ফুঁক করাই হচ্ছে সঠিক ত্বরীক্বা।

'ওষুধ জায়েয হলে তাবীয নয় কেন?'-এর জবাব :

যেসব ছূফীবাদীরা তাবীযকে জায়েয করতে চায়, তাদের দাবি হলো, অসুস্থ হলে যেমন ওষুধ নিতে হয় ঠিক তেমনি জিন বা বদনযরসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও হলো তাবীয। ওষুধ নেওয়া যদি জায়েয হয়, তাহলে তাবীয নেওয়াও জায়েয হবে!

তাদের দাবি চমৎকার হলেও ভিত্তি নেই। কারণ অসুস্থ হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে ওষুধ খেতে বলেছেন খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। হাদীছে এসেছে, জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, হারূন ইবনু মা'রূফ এবং আবূ তাহির ও আহমাদ ইবনু ঈসা (রাহিমাহুল্লা-হ) ...জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রতিটি ব্যাধির প্রতিকার রয়েছে। অতএব, রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়।[১১]

সুতরাং যেকোনো রোগের কারণে হালাল ওষুধ নেওয়া জায়েয। কিন্তু তাবীয কোনো ওষুধ নয়।

সেইসাথে ওষুধ নেওয়া এবং ঝাড়ফুঁক করা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা। কিন্তু তাবীয নেওয়া এবং দেওয়া কোনোটাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা নয়। অতএব, ওষুধের সাথে তাবীযের মিল খোঁজাটা সম্পূর্ণ বোকামি।

কুফরী কাজে তাবীয :

তাবীয জায়েয মনে করার কারণে অনেক মুসলিম দুনিয়াবী স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে তাবীযের সাহায্য নেয়। যেমন- জোর করে কাউকে বিয়ে করা, স্বামীকে বশ করা, মা সন্তানের সম্পর্ক নষ্ট করা, সম্পত্তি অর্জন, শত্রুর ক্ষতি করা ইত্যাদি।

এটা অনস্বীকার্য যে, জাদুটোনা সত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরও জাদু করা হয়েছিল। কিন্তু জাদুর পরিবর্তে জাদু করার শিক্ষা ইসলামে নেই। এটা আল্লাহর একটা পরীক্ষা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনোই তাবীয ক্বযব করেননি এবং করতে নির্দেশও দেননি। বরং যেকোনো ধরনের তাবীযকে নিষিদ্ধ করেছেন। সেইসাথে যেকোনো অসুস্থতায় ঝাড়ফুঁক ও দু'আ-কালাম পড়তে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৬২; আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৬; মিশকাত, হা/৪৫৩০।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৫৪; মিশকাত, হা/৪৫২৮।

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৫৩।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭২০।

১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৪।

ইসলামে মুছাফাহার বিধান

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন**

অভিধানের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় যে, মুছাফাহার আভিধানিক অর্থ হলো— করমর্দন করা, হাতে হাত মেলানো। আগন্তুক অথবা সাক্ষাৎকারীর হাত ধরে তাকে অভিনন্দন জানানোর নাম মুছাফাহা। কারও সাক্ষাৎ হলে মুখে সালাম আদানপ্রদান করে হাতে হাত মিলানো মুসলিম ঐতিহ্য ও সামাজিকতার অংশ এবং নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত আর ছাহাবীগণের রীতি-রেওয়াজ। দু'জন মুসলিমের মধ্যে দেখা হলে মুছাফাহা বা করমর্দন করা একটি ইসলামী রীতি ও উত্তম চরিত্র। এটি মুছাফাহাকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে এটি মুসলিমদের পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ দূর করে দেয়।

মুছাফাহার সংজ্ঞা :

মুছাফাহার পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমদের একাধিক মত পাওয়া যায়। প্রখ্যাত হাদীছ ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ 'হাতের তালু দ্বারা হাতের তালু ধারণ করার নাম মুছাফাহা বা করমর্দন করা'।[১] আল-হাত্তাব আল-মালেকী রহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْمُصَافَحَةُ: وَضْعُ كَفٍّ عَلَى كَفٍّ مَعَ مُلَازَمَةٍ لَهُمَا قَدْرَ مَا يُفْرَغُ مِنَ السَّلَامِ. 'মুছাফাহা হলো, সালাম থেকে অবসর না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর হাত সংযুক্ত থাকা অবস্থায় হাতের তালুর উপর হাতের তালু রাখা'।[২]

মুসলিমদের সৌহার্দপূর্ণ সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় হয় সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। তাই সুন্দর আচার-ব্যবহার প্রকাশের প্রতিটি ধরন আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দনীয়। কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সালাম আদানপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিনয় প্রকাশ পায়। পরস্পরে এমন ভালোবাসার দৃশ্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক পছন্দনীয়।

মুছাফাহার ফযীলত ও বিধান :

মুছাফাহার ফযীলতের ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীছটি হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا 'দু'জন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুছাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[৩] ছাহাবীগণের মাঝে মুছাফাহা একটি প্রসিদ্ধ অভ্যাস ছিল। ক্বাতাদা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, ছাহাবীদের সময়ে কি তাদের মধ্যে মুছাফাহার প্রচলন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪] ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সর্বস্তরের আলেমগণের মতে, মুছাফাহা একটি নেক কাজ আর সাক্ষাতের সময় মুছাফাহা করা সুন্নাত'।[৫] অবশ্য আলেমগণের কেউ কেউ বলেন, মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। আর অধিকাংশের মতে, মুছাফাহা করা সুন্নাত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর মতে মুছাফাহা মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে এসেছে, اِعْلَمْ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ। 'জেনে রাখুন! প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় মুছাফাহা করা মুস্তাহাব'।[৬]

মুছাফাহার নিয়ম :

মুছাফাহা (مصافحة) সংঘটিত হয় ব্যক্তির হাতের তালু (صفح) অপর ব্যক্তির হাতের তালুতে রাখার মাধ্যমে। এটাই আরবী ভাষার দাবী, ঠিক যেমনটি উদ্ধৃত হয়েছে 'মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ'[৭] ও অন্যান্য অভিধানে। মুছাফাহা সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদীছগুলোর আপাত মর্ম এভাবেই বুঝতে হবে। এ কারণে অধিকাংশ আলেমের মতে, এক হাতে মুছাফাহা করাই সুন্নাত হিসেবে যথেষ্ট এবং এটা ছিল মুসলিমদের মাঝে ও ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে সাধারণ অভ্যাস। আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আস-সিলসিলা আছ-ছহীহা'[৮] গ্রন্থে এক হাদীছের শিক্ষার মধ্যে উল্লেখ করেন, মুছাফাহার

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ১১/৫৪।
২. ইতহাফুল ইখওয়ান ফী হুকমি মুছাফাহাতিন নিসওয়ান, ১/১।
৩. আবূ দাঊদ, হা/৫২১২, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৬৩।
৫. ফাতহুল বারী, ১১/৫৫।
৬. ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, ৬/৩৮১।
৭. মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ, ৩/২২৯।
৮. সিলসিলা ছহীহা, ১/২২।

ক্ষেত্রে এক হাত দিয়ে ধরতে হবে। মুছাফাহার আলোচনা অনেক হাদীছে স্থান পেয়েছে। উল্লেখিত হাদীছটি যা প্রমাণ করছে, এ শব্দটির ভাষাগত বুৎপত্তিও সেটাই নির্দেশ করছে। আমি বলব, যে হাদীছগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলোর কোনো কোনোটি পূর্বোক্ত অর্থের প্রতি নির্দেশ করছে। যেমন— হুযাইফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক বর্ণিত মারফূ হাদীছ, 'নিশ্চয় এক মুমিন যখন অপর মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম দেয় এবং তার হাত (একবচনের শব্দ) ধরে তার সাথে মুছাফাহা করে, তখন তাদের দুই জনের **গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে যায়**'।[৯] আল-মুনযিরী রহিমাহুল্লা-হু বলেন, ত্বাবারানী হাদীছটি 'আল-আওসাত্ব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারও ব্যাপারে জারহ (নেতিবাচক মন্তব্য) উদ্ধৃত হয়েছে মর্মে আমি জানি না।[১০] আমি বলব, হাদীছটির কিছু শাহেদ (সমার্থক ভিন্ন হাদীছ) রয়েছে। যেগুলোর সহযোগিতায় হাদীছটি 'ছহীহ' পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এসবগুলো হাদীছ নির্দেশ করছে যে, মুছাফাহার ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে এক হাতেই ধরা।

মানুষের পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের পর একে অপরের সঙ্গে মুছাফাহা করে বা হাত মেলায়। এটিকে ইংরেজিতে হ্যান্ডশেক (Handshake), আরবীতে মুছাফাহা কিংবা বাংলায় করমর্দন বা হাত মেলানো বলে থাকে। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎকালে একে অপরের ডান হাত মিলিয়ে মুছাফাহা করা হয়। মুছাফাহা করতে হয় হাতের তালুর সাদা অংশ বা ভেতরের অংশ মিলিত করে। হাতের পিঠের অংশ মিলিয়ে মুছাফাহা হয় না। অথবা এক হাতের তালুর অংশ অন্য হাতের পিঠের অংশের সাথে মিলিয়ে মুছাফাহা হয় না।

মুছাফাহার সুন্নাতী পদ্ধতি :

মুছাফাহার সুন্নাতী পদ্ধতি হলো- মুছাফাহাকারী ব্যক্তিদ্বয় শুধু ডান হাতে মুছাফাহা করবে। আর যার সাথে সালাম করা হলো তার হাতের তালু সালামদাতার হাতের তালুতে রাখবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে মুছাফাহা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কেবল দু'হাত মিলানোর ব্যাপারে সম্মতি দেন।[১১] মুছাফাহা স্বাভাবিকভাবে উভয়ের ডান হাত মিলাবে, যা অত্যন্ত নেকীর কাজ।[১২]

সুতরাং এর বাইরে ঝাঁকি দেওয়া বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। মুছাফাহা করার সময় নির্ধারিত কোনো দু'আ পড়ার ছহীহ দলীল নেই। তবে হাদীছে আল্লাহর প্রশংসা ও ইসতিগফার করার কথা বলা হয়েছে। মুছাফাহার দু'আ আছে, তবে তা নির্ধারিত না। আমরা দেখতে পাই, আমাদের সমাজে এর একটি দু'আর প্রচলন রয়েছে।

পক্ষান্তরে, কিছু হানাফী আলেম ও মালেকী আলেম মত দিয়েছেন যে, দুই হাতে মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। তা এভাবে যে, বাম কব্জির তালু অপর ব্যক্তির কব্জির পিঠের ওপর রাখা— এ পদ্ধতিতে মুছাফাহা করা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসগত সুন্নাত বা আদর্শ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। বরং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যা বর্ণিত হয়েছে সেটা হলো, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ছাহাবীকে শিক্ষা দেওয়া ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ার সময় গুরুত্বারোপ করার জন্য তার হাতকে তিনি দুই হাত দিয়ে ধরেছিলেন। যেমনটি হাদীছে এসেছে— ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত তার হাতদ্বয়ের মধ্যে রেখে আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন।[১৩]

কিন্তু, এটি সাধারণ অভ্যাস ছিল না; যেমনটি ইতোপূর্বেই সাব্যস্ত হয়েছে যে, মূল পদ্ধতি ছিল এক হাতে মুছাফাহা করা। কোনো কোনো বর্ণনাতে সেটা দ্ব্যর্থহীনভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, বরং এ হাদীছেও সে দলীল রয়েছে। কারণ যদি এভাবে দুই হাত দিয়ে মুছাফাহা করাটাই অভ্যাস হতো, তাহলে ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ অবস্থাটির কথা উল্লেখ করতেন না। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ অবস্থাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছাহাবীগণের সাথে মুছাফাহা করার ক্ষেত্রে এটি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল না।

সুতরাং মুছাফাহা মুসলিমদের পারস্পরিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, অভিবাদন জ্ঞাপন, সম্ভাষণ, ইসলামের এক উত্তম ব্যবহারিক রীতি ও সৌজন্যের প্রতীক হিসেবে পারস্পরিক সালাম বিনিময় ও মুছাফাহা-করমর্দন রীতি ইসলামের সূচনাকাল থেকে প্রচলিত, যা বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতিরূপে

৯. সিলসিলা ছহীহা, হা/৫২৬।
১০. আল-মুনযিরী, ৩/২৭০।
১১. তিরমিযী, হা/২৭২৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/৪৬৮০।
১২. আবূ দাঊদ, হা/৫২১২; মিশকাত, হা/৪৬৭৯, হাদীছ ছহীহ।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০২।

সর্বদা পরিচিত। এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক শান্তি ও কল্যাণ কামনার অভিব্যক্তি হলো সালাম বিনিময়। একজন বলবেন, 'আস-সালামু আলাইকুম', অর্থাৎ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রতি উত্তরে অন্যজন বলবেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ', অর্থাৎ 'আপনার উপরও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক'। এ বিধান ইসলামে সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত। এতে উচ্চারিত প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে পুণ্যের শুভ সংবাদ রয়েছে।

মুছাফাহা কয় হাতে করবে :

মুছাফাহা কয় হাতে করতে হবে— এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি হলো এক হাতে মুছাফাহা করবে। অর্থাৎ শুধু ডান হাত দিয়ে মুছাফাহা করবে। দ্বিতীয় মতটি হলো— মুছাফাহা দুই হাতে হবে। অর্থাৎ ডান হাতের সাথে বাম হাতও যোগ করা হবে। তবে এক হাতে করার ব্যাপারে বেশি শক্তিশালী দলীল পাওয়া যায়। মুছাফাহা কয় হাতে হবে এ নিয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদকে প্রশ্ন করলে, তিনি জবাবে বলেছেন, মুছাফাহা সংঘটিত হয় ব্যক্তি তার হাতের তালু অপর ব্যক্তির হাতের তালুতে রাখার মাধ্যমে। এটাই আরবী ভাষার দাবী।[১৪] এ কারণে অধিকাংশ আলেমের মতে, এক হাতে মুছাফাহা করাই সুন্নাত হিসেবে যথেষ্ট এবং এটা ছিল মুসলিমদের মাঝে ও ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে সাধারণ অভ্যাস।

'আল-মাওসুআ আল-ফিক্বহিয়্যা' গ্রন্থের 'মুছাফাহা' অধ্যায়ে ও 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-তে বলা হয়েছে, 'দুই হাতে মুছাফাহা করার ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু জানি না বলে দুই হাতে মুসাফাহা করাটা অনুচিত। উত্তম হলো— এক হাতে মুছাফাহা করা'।[১৫] এজন্যই সঊদী আরবের সম্মানিত আলেমগণ এবং হারামাইন শারীফাইনের ইমামগণ দুই হাতে মুছাফাহা করাকে বিদআত বলে থাকেন। তাই উভয়ের শুধু ডান হাতে মুছাফাহা করাটাই সুন্নাত পদ্ধতি ও উত্তম।[১৬]

যাদের সাথে মুছাফাহা করা জায়েয :

ইসলামী শরীআত কোনো পুরুষ পরনারীর সাথে এবং কোনো নারী পরপুরুষের সাথে মুছাফাহা অনুমোদন করে না। এটা ইসলামে নাজায়েয বা হারাম। পুরুষ পুরুষের সাথে, নারীরা নারীর সাথে মুছাফাহা করবে- এটা ইসলাম অনুমোদিত ও স্বীকৃত। আজকের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের কৃষ্টি-কালচার যেভাবে দ্রুতগতিতে মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হচ্ছে, এটা নিঃসন্দেহে লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের কৃষ্টি-কালচার পরিত্যাগ করে ইয়াহূদী-নাছারাদের পদাঙ্ক অনুসরণে পরপুরুষ ও পরনারীর সাথে উদারতা ও আধুনিকতার নামে যেভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে, তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত কখনই কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি।[১৭] বিশিষ্ট ফক্বীহ আল্লামা রিয়াজ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুসাইমিরী বলেন, উম্মতের পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পরনারীর সাথে পুরুষের মুছাফাহা করা হারাম।[১৮] প্রচলিত চার মাযহাবের কোনো মাযহাবেই পরনারীকে স্পর্শ করা, হাত স্পর্শ করে মুছাফাহা করা অনুমোদন ও সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মেহরান বলেন, পুরুষ নারীর সাথে মুছাফাহা করতে পারবে কিনা? ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন, না। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। আমি বললাম, কাপড়ের সাহায্যে পুরুষ নারীর সাথে মুছাফাহা করতে পারবে কিনা? তিনি জবাব দিলেন, পারবে না; বরং পুরুষ নারীর সাথে যেকোনো মাধ্যমেই মুছাফাহা হারাম।[১৯]

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যাতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। মানুষের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুছাফাহা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যাহিক জীবনে মুসলিমদের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগে মুছাফাহার বিধান পরিপূর্ণ মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৪. দেখুন: https://islamqa.info/ar/answers/92806/
১৫. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৭/৪৩১-৪৩৩।
১৬. সঊদী শরীআহ বোর্ডের স্থায়ী কমিটির ফতওয়াসমগ্র, ২৪/১২৫।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৬।
১৮. ইতহাফুল ইখওয়ান ফী হুকমি মুছাফাহাতিল নিসওয়ান, পৃ. ৪।
১৯. ইতহাফুল ইখওয়ান ফি হুকমি মুসাফাহাতিল নিসওয়ান, পৃ. ৫।

পাশ্চাত্য বিশ্বে ইসলাম ফোবিয়া : সমস্যা ও সমাধান

-মাযহারুল ইসলাম*

ফোবিয়া (Phobia) বলতে বুঝায় ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক। ফোবিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ফোবোস' (phóbos) থেকে এসেছে, যার মানে হচ্ছে ভয়। ফোবিয়া বা অস্বাভাবিক ভীতিকে বর্ণনা করা হয় একটি স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী ভয় হিসেবে, যা কোনো বস্তু অথবা স্থান হতে পারে। ফোবিয়া মূলত এক ধরনের অযৌক্তিক ভয়, যেটার পরিমাণ সাধারণ ভয় থেকে কয়েক গুণ বেশি হয়ে থাকে। এর বাস্তব রূপ এমন হতে পারে যে, ব্যক্তি মানসিক চাপে সর্বদা দুশ্চিন্তায় ভোগে, মনের গহীনে ভয়ের লালন করে দিনাতিপাত করে। আর সেটা যদি ইসলামের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে এর অর্থ হয় ইসলাম বিষয়ে ভয় বা ত্রাস। তাহলে সহজে বোধগম্য হয় যে, ইসলাম শান্তির বার্তা দেয় না, বরং ইসলাম মানুষকে ত্রাসের শিক্ষা দেয়, ইসলাম সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। আর এই ফোবিয়া শব্দটাই পাশ্চাত্য সমাজ লুফে নিয়ে অন্য ধর্মের সাথে যুক্ত না করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামের সাথে যুক্ত করে মিডিয়ার কল্যাণে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের ব্যাপারে জনগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। ফলে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করে এবং ইসলামের ব্যাপারে বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি পেশ করতে আগ্রহী হয়। আর এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অধুনা বিশ্বে ইসলামবিদ্বেষী পাশ্চাত্য সমাজ দিন-রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, ইসলাম পৃথিবীর বুকে হাজার কোটি মানুষের হৃদয়ে স্বমহিমায় অম্লান হয়ে থাকবে, ইসলামের গতি আরো শতগুণে ত্বরান্বিত হবে ইনশাআল্লাহ। আর এটাই বিশ্ববাসী খুব ভালো করে অবলোকন করছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি—

(ক) কানাডার খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারক ডক্টর গ্যারি মিলার কুরআনের ভুল খুঁজতে এসে সূরা আন-নিসার ৮২ নং আয়াত পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

(খ) খ্রিষ্টান ফরাসি নারী লায়লা হুসাইন ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম প্রতীক নারীর হিজাব দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হন।

(গ) আব্দুর রহীম গ্রীন বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বড় একজন পণ্ডিত। অবশেষে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে এসে তিনি মুসলিম হন।

প্রিয় পাঠক! এখন প্রশ্ন হলো, কোন্ সেই ফোবিয়া, যা এসব মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে? কোন্ সেই ফোবিয়া, যা তাদের ইসলাম সম্পর্কে জানতে কৌতূহল, উদ্দীপনা অনেক গুণ বাড়িয়েছে? নিঃসন্দেহে যে বা যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে তা বিবেচনা করবে, অবশ্যই সে সত্য জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত করে সৌভাগ্যশীলদের কাতারে শামিল করতে সক্ষম হবে। ইসলাম এমনই। যত বেশি ইসলামের উপর আঘাত আসবে, ইসলাম তত বেশি আপন গতিতে নিজের রূপ, সৌন্দর্য, উদারতা, ভালোবাসা অকাতরে পরিস্ফুটিত করবে।

মিডিয়ায় ইসলাম ফোবিয়া সম্পর্কে কারসাজি :

সত্যি বলতে কি বিশ্বব্যাপী ইসলামবিদ্বেষী স্বার্থান্বেষী মহল ইসলামের ব্যাপারে অসার তকমা লাগিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় অবাধে প্রচার করে আসছে যে, ইসলাম একটি চরমপন্থী ধর্ম। ইসলাম তরবারির জোরে মানুষকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে। ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণও আসলে তরবারি। এমনি শত খোঁড়া যুক্তি ও অসার বাক্য পেশ করে ইসলামবিদ্বেষী মহল। যার ফলশ্রুতিতে অমুসলিমরা ইসলামকে বড় আতঙ্কের বিষয় মনে করে। যেভাবেই হোক নিজেকে মুসলিমদের থেকে কীভাবে দূরে রাখা যায়, সে ব্যাপারে খুবই সচেতনতা অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষত বিশ্ব মিডিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার কারণে ইসলামের ব্যাপারে এ ধরনের হীন, নোংরা ষড়যন্ত্রের কারসাজি চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইসলামবিদ্বেষীদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ব মিডিয়ার এই অবাধ বিচরণে স্বভাবতই অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বুঝের বদলে ইসলামের ব্যাপারে নানাবিধ বিরূপ ও উগ্র মন্তব্য মনের গহীনে লালন করে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কিছু হোক না কেন যদি সেখানে মুসলিম অন্তর্ভুক্ত থাকে বা কোনো গন্ধও পায় তাহলে বিশ্ব মিডিয়ায় খুব বড় ফোকাসে মুসলিমদের সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রচারণা চালায়। এক্ষেত্রে মুসলিমরা দোষী হোক আর না হোক, তা তাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকে না। মূলত তাদের ষড়যন্ত্রই হলো ইসলামের ব্যাপারে কুৎসা রটানো। তারা আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, কাশ্মীর, সোমালিয়া ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা যখন তাদের জান, মাল ও ন্যায্য অধিকার রক্ষার স্বার্থে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন স্বার্থান্বেষী মহল ঐ সকল নির্যাতিত মুজাহিদদেরকে বিশ্ব মিডিয়ায় সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মৌলবাদী বলে প্রচারণা চালায়। অথচ তারা মুসলিম মুজাহিদের ছালাতের দৃশ্য ভুল করেও মিডিয়ায় প্রচার করে না। ধিক! এ সকল স্বার্থান্বেষী মহলকে!

ইসলাম ফোবিয়া সম্পর্কে খোঁড়া যুক্তি খণ্ডন :

(১) ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচার হয়েছে। ফলে ইসলামের অনুসারী সর্বত্র বেশি।

জবাব : ইসলাম শান্তির ধর্ম। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, প্রত্যেক জনপদে ইসলাম কেবল শান্তির বার্তা দিয়েছে। ইসলাম অশান্তির দাবানল

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

থেকে শান্তিতে বসবাসের জন্য মানুষকে আহ্বান করে। ফলে মানুষ পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য, সুখের নীড় গড়ার জন্য, মানুষকে মানুষের প্রভুত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য, নিজের সম্মানকে অটুট রাখার জন্য মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়। ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করে নিষিদ্ধ পথের যাত্রীরা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম তার রূপ, সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে বলেই অমুসলিমদের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে প্রকাশ্যে তারা ইসলামের যতই বিরোধিতা করুক না কেন অবশেষে ইসলামের মহান আদর্শের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অন্যান্য ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বা প্রচারের ক্ষেত্রে যেরূপ জোরজবরদস্তি করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে হয়নি। এমনকি তারা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, অনাহারে রেখে, নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে তাদেরকে সেই সকল ধর্ম মানার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আয়োজন করে। কিন্তু আপনি কি কখনও ইসলামের ব্যাপারে এমন শুনেছেন যে, অমুক মুসলিম ঐ বিধর্মীকে নির্যাতন চালিয়েছে মুসলিম বানানোর জন্য। আপনি কি দেখেছেন অমুক মুসলিম কোনো বিধর্মীকে অঢেল সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম বানিয়েছে। না, এরকম অপ্রত্যাশিত খবর আপনি কখনো শুনতে পাননি আর আশা করি ভবিষ্যতেও পাবেন না। ইসলাম জোরজবরদস্তির নাম নয়। বরং ইসলাম মানব মনের গহীন থেকে উৎসারিত এক সন্তুষ্টির নাম। যখন কোনো মানুষ স্বেচ্ছায়, সুস্থ বিবেকে ইসলাম গ্রহণ করবে, ঠিক তখনই সে মুসলিম বলে বিবেচিত হবে। যেখানে থাকবে না কোনো প্রকারের অর্থের প্রলোভন, থাকবে না কোনো অসহনীয় নির্যাতনের স্টিম রোলার, থাকবে না কোনো প্রকারের জোরজবরদস্তি। আর ইসলাম মানবমণ্ডলীকে এটাই শিক্ষা দেয় *(দ্র. আল-বাক্বারা, ২/২৫৬)*।

আজকে আফসোসের বিষয় হলো, পাশ্চাত্য সমাজ ইসলামকে তরবারি দ্বারা প্রসারিত হয়েছে বলে বিরূপ মন্তব্য করে। এক্ষেত্রে আমি তাদের দোষ দিব না। কেননা তারা এমন পরিবেশে জীবনযাপন করছে যেখানে তাদের মিডিয়া সব রকমের প্রযুক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য, বিরূপ কথা, নেতিবাচক সংবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে কান ভারি করে দিচ্ছে। অথচ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, মুসলিমরা প্রায় ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছে, তারা ভারতীয় উপমহাদেশও প্রায় হাজার বছর শাসন করেছে। অথচ ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না যে, অমুসলিমরা তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। বরং সকল ধর্মের মানুষ সুন্দর, স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে মুসলিমদের শাসনামলে। তারা তাদের ধর্ম নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে মেনে চলত। মুসলিম শাসকগণ তাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠ তরবারি হলো, মহোত্তম আদর্শ, উন্নত চরিত্র, মাধুর্যপূর্ণ নম্র আচরণ। ফলে ইসলামের অনুসারী যেখানেই গিয়েছে, ঠিক সেখানেই সোনার ফসল ফলিয়েছে। ইংরেজ লেখক 'ডি লিসী' তার বইয়ে 'Islam At The Cross Road' বইয়ের ৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, ইতিহাসে এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রসার লাভ করেছে। এ ধরনের অভিযোগ কম বুদ্ধি ও অল্প ধীসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য।

(২) ইসলাম মানুষের জানের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়।

জবাব : ইসলাম সম্পর্কে যে ব্যাপক অধ্যয়ন করবে, সে ইসলাম সম্পর্কে অন্য আর যা কিছু শিখুক না কেন ইসলাম যে মানুষের সর্বপ্রথম জীবনের নিরাপত্তা দেয় সেটা বুঝতে সে মোটেও ভুল করবে না। আপনি যদি ইসলামের বিষয়গুলো ভালোভাবে অবলোকন করেন এবং যদি আপনার জানার কৌতূহল পাহাড়সম হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি ইসলামের এই সুমহান মেসেজটি প্রত্যেক পাতায় পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা যমীনে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল' *(আল-মায়েদা, ৫/৩২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করে হত্যাকাণ্ড করবে, আমি তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব' *(আন-নিসা, ৪/৩০)*। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কোনো যিম্মীকে হত্যা করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[১] এমনকি ইসলাম মানুষের জানের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে জীবনের চূড়ান্ত সীমার শেষ মুহূর্তে খাদ্যাভাবের কারণে হারাম বস্তুকে খাওয়ার অনুমতি প্রদান করে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামে জানের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে।

(৩) ইসলাম খুবই কঠোর, উগ্রপন্থা ও চরমপন্থার ধর্ম।

জবাব : ইসলামই কেবল সহজ, সরল ও নমনীয় ধর্ম। যা মানুষকে কখনও কঠোরতা, উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা শেখায় না। এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৬)*। আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যের বাইরে *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*। আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি *(আল-হাজ্জ, ২২/৭৮)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদেরকে মূলত সহজ করেই পাঠানো হয়েছে, কঠিন করে পাঠানো হয়নি'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ সরল, কঠিন নয়। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা

১. আবূ দাঊদ, হা/২৭৬০; নাসাঈ, হা/৪৭৪৭।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৬; মিশকাত, হা/৪৯১।

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং নিকটবর্তী হও, আশান্বিত থাক'।[3] রাসূল আরও ﷺ বলেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে একজন সহজপন্থী শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন'।[৪]

এছাড়াও ইসলাম প্রত্যেক বিধানের ক্ষেত্রে মানব জাতিকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার জন্য জোরালো দিকনির্দেশনা পেশ করে। একথা জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম চরমপন্থা আর নরমপন্থার নাম নয়, বরং ইসলাম হলো মধ্যমপন্থার নাম। তাই এই মধ্যমপন্থার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানা, বুঝা আর উপলব্ধির জন্য পাশ্চাত্য সমাজের কোনো সমস্যা আছে কি?

(৪) ইসলাম প্রগতির অন্তরায়।

জবাব : Progress শব্দটি ইংরেজি। যা ল্যাটিন শব্দ Prograde থেকে উদ্ভূত। প্রগতি অর্থ উন্নতি, অগ্রগতি, উৎকর্ষতা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয়সহ যাবতীয় বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করাই হলো প্রগতির আলোচ্য বিষয়। আধুনিক প্রগতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় আঠারো শতকে ভল্টোয়ার, রুশো, হবস, লক প্রমুখের হাত ধরে। ফলে ধর্মবিদ্বেষীদের আস্ফালনে প্রগতিবাদ আন্দোলনে আরো অনেক মতাদর্শ নতুন মাত্রায় যোগ হয়। জন্ম নেয় ডারউজম মতবাদ। আধুনিক প্রগতিবাদীরা ধর্মের ব্যাপারে খুবই গোঁড়ামি ও বিদ্বেষমূলক আচরণ করে বলে, ধর্ম আলাদা বিষয় আর প্রগতি আলাদা বিষয়। এজন্য তারা ধর্মের সাথে আপস না করে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে প্রগতিবাদকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ চরম সত্য কথা হলো ইসলামই কেবল প্রগতির ধর্ম। যদি তারা গভীর দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে ইসলাম ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে উন্নতি, উৎকর্ষতা চায়। এক্ষেত্রে মোটেও ইসলাম প্রগতির অন্তরায় নয়। বরং ইসলাম প্রগতির সহায়ক। ইসলাম ছাড়া প্রগতি অচল। ইসলাম কখনো প্রগতির বিরুদ্ধে নয়। এজন্য ইসলামে প্রগতিবাদ বুঝতে হবে এবং খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আধুনিক প্রগতিবাদ ও ইসলামী প্রগতিবাদের পার্থক্য :

১. আধুনিক প্রগতিবাদ সময়, ভূখণ্ডের দাবিতে পরিবর্তনশীল।
ইসলামী প্রগতিবাদ সর্বদা অপরিবর্তনশীল।

২. আধুনিক প্রগতিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দুনিয়ার উন্নতি, উৎকর্ষতা।
ইসলামী প্রগতিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি, উৎকর্ষতা।

৩. আধুনিক প্রগতিবাদের সমস্যা ও সমাধান প্রগতিবাদীরা করে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক মেজাজে।
ইসলামী প্রগতিবাদের সমস্যা ও সমাধান হয় অহীভিত্তিক সিলেবাসে।

৪. ইসলামী প্রগতিবাদ সকল যুগেই শ্রেষ্ঠ।

৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামী প্রগতিবাদের অবদান সকল যুগেই অতুলনীয়।

৬. আধুনিক প্রগতিবাদ মানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।
ইসলামী প্রগতিবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

৭. আধুনিক প্রগতিবাদ মানে নারীবাদী আন্দোলন, নারীর সম্মান হরণ।
ইসলামী প্রগতিবাদ মানে নারীর যথাযোগ্য সম্মান প্রদান।

৮. আধুনিক প্রগতিবাদ মানে ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের আস্ফালন।
ইসলামী প্রগতিবাদ মানে ইসলামের একমাত্র অনুসরণ।

৯. আধুনিক প্রগতিবাদ মানে নাস্তিক্যবাদকে প্রমোট করা।
ইসলামী প্রগতিবাদ মানে আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে সুন্দর জীবন গড়া।

(৫) ইসলাম কি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম?

জবাব : ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম (Islam is a science based religion)। ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। সেই বিজ্ঞানের অনেক কিছু ইসলামেরই উৎসমূল থেকে উৎপন্ন। আল-কুরআনে বিজ্ঞানের বহু উৎস রয়েছে। দেখুন ইসলামের বিজ্ঞানভিত্তিক দিক নির্দেশনা যা পাশ্চাত্য সমাজ আজ গবেষণা করে খুঁজে পাচ্ছে এবং এই গবেষণায় কেবল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি পায়। যেমন-

১. চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, যা সূরা আল-ফুরক্বানের ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে। আর বিজ্ঞান আজকে এই থিওরি প্রমাণ করছে।

২. চাঁদ ও সূর্য নিজ কক্ষপথে চলে যা বলা হয়েছে সূরা আল-আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে। যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে আজকের যুগে।

৩. বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অধ্যায় দখল করে আছে 'বিগ ব্যাং থিওরি'। যা মহান আল্লাহ তাআলা আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে সূরা আল-আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলেছেন। যা আজকের বিজ্ঞান তালাশ করে তথ্য অনুসন্ধান করে আমাদেরকে দিচ্ছে।

(৬) মুসলিমরা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী।

জবাব : বর্তমান বিশ্বে অমুসলিমদের দ্বারা সর্বাধিক আলোচিত সমালোচিত বিষয় হলো- মুসলিমরা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, জঙ্গী ইত্যাদি। যখন কোনো ধর্মসংক্রান্ত বিষয় উত্থাপিত হবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দাঁড় করানো হয় ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা সন্ত্রাসী, না হয় জঙ্গী! এই পরিভাষাগুলো পাশ্চাত্য সমাজ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জোরালো প্রয়াসে প্রচার করে আসছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী বলে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। চাই সেক্ষেত্রে মুসলিমরা দোষী হোক আর না হোক।

মহান আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪৬।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৬৩; মিশকাত, হা/৩২৪৯।

ফ্রিডম অব চয়েস এন্ড কুরআনিক প্রেসক্রিপশন

-মো. হাসিম আলী*

ইংরেজি ‘ফ্রিডম’ শব্দের অর্থ স্বাধীনতা। আর ‘চয়েস’ অর্থ পছন্দ। সুতরাং ‘ফ্রিডম অব চয়েস’ অর্থ পছন্দের স্বাধীনতা। কর্মের স্বাধীনতা অর্থেও শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। ফ্রিডম অব চয়েস বুঝতে হলে তার আগে স্বাধীনতার অর্থ জানা প্রয়োজন। স্বাধীনতা হলো নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে ইচ্ছামতো সবকিছু করার স্বাধীনতা দিলে সমাজে অন্যদের ক্ষতি হতে পারে, যা অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় স্বাধীনতা বলতে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের বাধা অপসারণ করে। সুতরাং ফ্রিডম অব চয়েস বলতে একথাই বেশি যুক্তিযুক্ত যে, যে কারো কিছু করার বা না করার মধ্যে যেকোনো একটা পছন্দ করার ক্ষমতা।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ফ্রিডম অব চয়েস বলতে কর্মের স্বাধীনতা বুঝিয়েছেন। তার মতে, ব্যক্তি যা করতে চায় সেটা স্বাধীনভাবে করার সামর্থ্য থাকা হলো ফ্রিডম অব চয়েস।

মোটকথা, ফ্রিডম অব চয়েস বলতে কমপক্ষে দুটি বিকল্পের কোনো একটিকে গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বুঝানো হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কোনো কিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কি আসলেই স্বাধীন? এক্ষেত্রে জ্যাঁ জ্যাক রুশোর উক্তিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘Man is born free, but everywhere he is in chain’ অর্থাৎ মানুষ এ পৃথিবীতে মুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতিটি পদেই সে শৃঙ্খলিত। হাজারো নিয়মে বাঁধা তার জীবন। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় কিছু নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি তাকে অনুগত থাকতেই হয়। তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় পরিবারের নিয়ম-কানুনের প্রতি, মেনে চলতে হয় সামাজিক রীতি-নীতি, আনুগত্য করতে হয় রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি।

প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি শর্তসাপেক্ষ কিছু ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে মাত্র। যেমন, ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই কোনো ব্যক্তি তার পছন্দমতো কিছু খেতে পারে না। খাওয়ার আগে তাকে চিন্তা করতে হয়ে সেটি বৈধ, না-কি অবৈধ। ব্যক্তি যা ইচ্ছে তা-ই বলতে পারে না। বলার আগে উচিত কিংবা অনুচিত সম্পর্কে তাকে ভাবতে হয়। সে ইচ্ছামাফিক সব জায়গাতে যেতেও পারে না। তার আগে তার প্রবেশাধিকার সম্পর্কে ভাবতে হয়, অনুমতি নিতে হয়। সে ইচ্ছামতো কোনো পোশাক পরতেও পারে না। পোশাকটি তার আদর্শ, আবহাওয়া এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। ঠিক এমনিভাবে সে ইচ্ছা করলেই নিজেকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে না। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপজ্জনক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। নিজের জীবনকে শেষ করে ফেলতে পারে না। ইচ্ছে করলেই নিজের মালিকানাধীন সম্পদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে না। নিজের সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে না। সমাজের প্রচলিত নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বল্গাহীন জীবনযাপন করতে পারে না। অবৈধ পেশায় জড়িত হতে কিংবা অবৈধ পণ্যের কারবার করতে পারে না। ইচ্ছামাফিক কারো জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না। কোনো প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে অবজ্ঞা বা কটাক্ষ করতে পারে না। কারো বোধ-বিশ্বাসের দেয়ালে আঘাত করতে পারে না। অন্যায়, অবাধ্যতা কিংবা অশ্লীল কাজে উস্কানি দিতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন-কানুনকে অবহেলা কিংবা অস্বীকার করতে পারে না। পারে না আন্তর্জাতিক আইন-কানুনকে অমান্য করতে। কারণ, এসবের অধিকার তাকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কেউই দেয়নি। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বলতে পারে যে, দেহ আমার সিদ্ধান্তও আমার, আমি যেমন খুশি তেমন চলব! যেমন খুশি তেমন সাজব! যেমন খুশি তেমন পরব! যখন যা খুশি তা-ই করব! আমাকে কিছু বলার অধিকার কারো নেই! নেই বাধা দেওয়ার অধিকার! এ জাতীয় গর্হিত বক্তব্য ও আচরণ নিঃসন্দেহে মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, নৈতিক মানদণ্ডকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, অপরাধপ্রবণতাকে উৎসাহিত করে এবং নিজের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করে। সর্বোপরি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে তথা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে। কারণ, প্রথমত, ব্যক্তি একটি পরিবারের সদস্য। তাকে পরিবারের মান-সম্মান,

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের প্রতি আনুগত্য করতে হয়। পরিবারের সম্মানহানি হয় এমন কাজ সে করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে তাকে বসবাস করতে হয়, সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি তাকে মান্য করতে হয়। সমাজবিরোধী কাজের অর্থই হলো গণদুশমনে পরিণত হওয়া, গণ-ধিক্কৃত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া। তৃতীয়ত, ব্যক্তি রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা তথা অধিকার-স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে সে রাষ্ট্রের প্রচলিত রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন মেনে চলতেও বাধ্য। কেউ কি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কখনো, না-কি ভবিষ্যতে কখনো পারবে?

এছাড়া, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের রয়েছে অপরিসীম প্রভাব। ধর্মই মানুষকে প্রকৃত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতাতেই সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ছিল ধর্ম। বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীর মানুষের প্রায় সবাই কোনো না কোনো ধর্ম-আদর্শকে বিশ্বাস করে। ধর্মকে কোনো আস্তিক ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। কারণ সে তো ধর্মকে ধারণ করেই বেঁচে থাকে এবং তার জীবনের সকল চিন্তা এবং কর্ম আবর্তিত হয় ধর্মকে কেন্দ্র করেই। আবার, প্রত্যেক ধর্মেরই রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান। একজন আস্তিক ব্যক্তি তার নিজের ধর্মীয় বিধান মেনে চলেন এবং তা মানতে তিনি বাধ্য।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে ইদানীং কিছু অপরিণামদর্শী, অকালপক্ক, রুচিহীন, অসভ্য ব্যক্তিকে তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান, মূল্যবোধ-বিশ্বাস, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেখা যাচ্ছে। তাদের কেউ বস্ত্রের ওজন কমাতে চাচ্ছেন, কেউ নিজের শরীরকে পণ্য হিসেবে বিক্রির অধিকার চাচ্ছেন, কেউ জন্তু-জানোয়ারের মতো উলঙ্গপনায় মেতে উঠতে চাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ আবার অর্থ সাশ্রয় এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর চাপ কমাতে ছোট ছোট পোশাকের পক্ষে সাফাই গাচ্ছেন। এসবই করা হচ্ছে অধিকারের নামে, স্বাধীনতার নামে। অথচ তারা ভুলে যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এক বিষয় নয়। তারা আসলে বিষবাষ্পে গোটা সমাজকে কলুষিত করতে চাচ্ছে। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে বর্তমান সময়ের পোশাক বিতর্ক। মাত্র কিছুদিন আগে একটি রেলস্টেশনে প্রায় ২০ জন অর্ধ-উলঙ্গ নারীকে দেখা গেছে তাদের মতোই আরেক অর্ধ-উলঙ্গ নারীর পক্ষে মানববন্ধন করতে। এরপর রাজধানীর একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের কয়েক জন শিক্ষার্থীকে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় অশালীন পোশাকে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধনে অংশ নিতে দেখা গেছে। শিক্ষিত নামের এসব পিশাচদের শারীরিক ভাব, ভাষা এবং ভঙ্গী দেখে পুরো জাতির মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে গেছে। তারা আমাদের পূর্বসূরী সম্মানিত কন্যা, ভগ্নি, মাতা, ফুফু, নানি, দাদিদেরকে অসম্মানিত করেছে, তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছে। তারা আমাদের নারী সমাজকে অশ্লীলতায় এবং অবাধ্যতায় উসকানি দিচ্ছে। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার বৃথা প্রয়াস চালাচ্ছে। পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা এসব বেহায়াপনা, অশ্লীলতার ফেরিওয়ালা কথিত নারীবাদীদের এখনই থামাতে হবে। এজন্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবাইকে যথাযথ দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর...’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ‘আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের পথে ডাকুন প্রজ্ঞা, সদুপদেশের মাধ্যমে। আর (প্রয়োজনে) তাদের সাথে তর্ক (যুক্তি বিনিময়) করুন উত্তম পন্থায়’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে আহ্বান জানাবে, মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ‘তারা এমন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা ছালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে’ *(আল-হজ্জ, ২২/৪১)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’।[১] অন্য হাদীছে

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো প্রকার খারাপ কাজ হতে দেখে, সে যেন তার হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। যদি এ শক্তি তার না থাকে, তাহলে মুখের কথা দিয়ে তা প্রতিহত করে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে মন দিয়ে তা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা করে। আর অন্তর দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করা ঈমানের দুর্বলতম এবং সর্বনিম্ন স্তর’।[২]

এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কুরআনিক ফর্মূলাই হতে পারে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ‘হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধানতার পোশাক, এটিই সর্বোৎকৃষ্ট। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/২৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘ঈমানদার পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গ সংযত করে, এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে... তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ‘তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে আর মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে তাদেরকে তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক, যা তাদেরকে সীমাহীন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিপতিত করবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ‘আর আমি তাকে (ভালো এবং মন্দ) দু’টি পথই দেখিয়েছি’ *(আল-বালাদ, ৯০/১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا - إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ ‘আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি’ *(আদ-দাহর, ৭৬/৩-৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ ‘বলুন! তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা মিথ্যা বলছ, ফলে অনিবার্য শাস্তি নেমে আসবে’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৭)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ ‘বলুন! সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। আমি যালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি...’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৯)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ‘সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, তবে আমি তাকে ওই দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব’ *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*।

হাদীছেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ওইসব পাপিষ্ঠদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘যে নারী পুরুষের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যে পুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে সে আমাদের (মুসলিম সমাজের) মধ্যে গণ্য নয়’।[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নারীদেরকে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা অশ্লীল, দুর্গন্ধময় বস্তাপচা নগ্ন অপসংস্কৃতির বিষবাষ্প থেকে আত্মরক্ষা করে প্রকৃত সত্য ও সৌন্দর্যের আধার ইসলামের আলোয় আলোকিত হওয়ার এবং স্বীয় স্রষ্টা, সমাজ এবং স্বজাতির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮; মিশকাত, হা/৫১৩৭।

৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৭৫।

র‍্যাগ-ডে সম্পর্কে ইসলাম

-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান*

সম্প্রতি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে এই বার্ষিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী পরবর্তী ক্লাসে পড়ার সুযোগ পায়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দে পরবর্তী ক্লাসে পদার্পণ করে থাকে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ক্লাসে উঠার আগেই বর্তমান নতুন এক অপসংস্কৃতি পালন করতে শুরু করেছে, যাকে বলা হয় **র‍্যাগ-ডে**। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবনের শেষ দিনটা স্মৃতিময় করে রাখতে এই অপসংস্কৃতি পালন করে থাকে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, এই র‍্যাগ-ডে নামক অপসংস্কৃতি আদৌ ইসলামের সাথে যায় কিনা? তাহলে চলুন আজ আমরা এই র‍্যাগ-ডে সম্পর্কে কিছু জেনে নিই।

র‍্যাগ-ডে অর্থ কী?

'Rag' শব্দের অর্থ গোলমাল বা হৈ-হুল্লোড় আর Day হলো দিন। সুতরাং র‍্যাগ ডে'র অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় 'হৈ-হুল্লোড়ের দিন' বা 'গোলমালের দিন'। তবে সাম্প্রতিককালে RAG শব্দটির জন্য বেশ কয়েকটি Bacronym ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন— Raise And Give, Raise A Grand, Raising And Giving- যা কিনা বড় কোনো দাতব্য তহবিল গঠনের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে।[১]

যদি র‍্যাগ ডে'র আভিধানিক অর্থ দেখি, তাহলে YourDictionary.com অনুসারে র‍্যাগ ডে'র অর্থ হলো— A day on which university students do silly things for charity, often the culmination of rag week. অর্থাৎ, এমন একটি দিন যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছোটখাটো কিছু দাতব্য কাজ করে থাকে। সাধারণত সপ্তাহের শেষ দিন তারা এমনটি পালন করে।[২]

আবার Oxford English Dictionary অনুসারে শুধু Rag শব্দটির অর্থ হলো— Rag as an act of ragging especially extensive display of noisy, disorderly conduct carried out on in defiance of authority. অর্থাৎ, এমন কোনো গোলমাল, বিরক্তিকর, হৈ-হুল্লোড়পূর্ণ দিন, যেদিন কর্তৃপক্ষকে দ্বন্দ্বার্থে আহ্বান করা হয় বা অবাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য কোলাহলময়, বিশৃঙ্খল আচরণ বা কাজকর্ম করা হয়।[৩]

র‍্যাগ-ডে প্রথম যেভাবে শুরু হয় :

দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম র‍্যাগ ডে পালন করা হয় ১৯২৫ সালে ইউভার্সিটি অব প্রিটোরিয়ায়। শিক্ষার্থীরা সেসময় রাস্তায় শোভাযাত্রা করতে বের হতো। যার প্রচলন আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। যুক্তরাজ্যে র‍্যাগ-ডে উদযাপন করা হয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত দাতব্য সংস্থার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। নাইজেরিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে র‍্যাগ-ডে উদযাপন করা হয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত দাতব্য সংস্থার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। নাইজেরিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে র‍্যাগ-ডে পালন করা হয় স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য কর্মকাণ্ড বা দরিদ্রদের জন্য তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে। আফ্রিকায় র‍্যাগ-ডে'কে বলা হয় JOOL (Jou Onbaatsugtige Opoffering vir Liefdadigheid) যার অর্থ– 'Your selfless sacrifice for charity.' যা প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পালন করা হয়।[৪]

আমাদের সমাজে র‍্যাগ-ডের বর্তমান অবস্থা :

আজ থেকে গত কয়েক বছর আগেও এই র‍্যাগ-ডে নামক শব্দটির সাথে আমাদের তেমন কোনো পরিচিত ছিল না কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সমাজে এই র‍্যাগ-ডে নামক অপসংস্কৃতি এমনভাবে বিস্তার করেছে যা বলার বাইরে। শুরুর দিকে পাশ্চাত্যে র‍্যাগ-ডে অভাবী দরিদ্রদের জন্য তহবিল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে কাজ করলেও আমাদের সমাজে যা দেখা যায় তা পুরোই উল্টো। কেননা আমাদের সমাজে যেভাবে র‍্যাগ-ডে পালন করা হয়, তা প্রাথমিক অবস্থার মতো নয়। আমাদের সমাজে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে র‍্যাগ-ডে পালন হয়ে থাকে গান, বাজনা, হৈ-হুল্লোড়, রং মাখামাখি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে। যা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বহির্ভূত কাজ। তাছাড়াও আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পাই যে, র‍্যাগ-ডে উদযাপনকালীন সময় ছেলে-মেয়েরা সাদা রঙের

---

* এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী, সরকারি মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা।

১. https://newsviews.media/rag-day-previous-present/

২. https://newsviews.media/rag-day-previous-present/

৩. https://newsviews.media/rag-day-previous-present/

৪. https://newsviews.media/rag-day-previous-present/

টি-শার্ট অথবা গেঞ্জি পরে একজন আরেকজনের গেঞ্জিতে মার্কার দিয়ে বিভিন্ন বাক্য লিখতে। তাদেরকে দেখি, পরস্পর একাকার হয়ে রং মাখামাখি করতে।

র‍্যাগ-ডের কিছু কুফল :

র‍্যাগ-ডে চলাকালীন একে অপরকে নানা ধরনের রং অথবা জরি দিয়ে থাকে এবং সেগুলো কারো চোখে অথবা মুখে লেগে থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

র‍্যাগ-ডে পালনকালীন সময় বড় বড় সাউন্ড বক্স দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনা বাজানো হয়, এতে করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে যারা বসবাস করে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অসুস্থ কিংবা ছোট্ট শিশুদের ক্ষতিটা সবচেয়ে বেশি হয়।

র‍্যাগ-ডে পালন করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে চাঁদা উঠানো হয়। এতে দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিপাকে পড়ে।

র‍্যাগ-ডে চলাকালীন সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রী মাদকতার সংস্পর্শে আসে, যা একপর্যায়ে পরিবার এবং সমাজে টেনে নিয়ে আসে এক কালো অধ্যায়।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাগ-ডে নিয়ে র‍্যালি বের হতে, এতে শত শত ছাত্র-ছাত্রীদের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে জনসাধারণের ভোগান্তি হয়।

র‍্যাগ-ডে-এর কারণে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ হয় এবং যেনা-ব্যভিচারের পথ উন্মোচিত হয়।

র‍্যাগ-ডে সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

র‍্যাগ-ডে পালন করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম এবং একটি গর্হিত কাজ। কারণ প্রথমত, র‍্যাগ-ডে একটি বিজাতীয় সংস্কৃতি। বিজাতীয় সংস্কৃতি পালন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (হয়ে যাবে)’।[৫]

৫. আহমাদ, ২/৫০; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাদীছ ছহীহ।

দ্বিতীয়ত, র‍্যাগ-ডে তে নানা ধরনের গান-বাজনা বাজানো হয় এবং নানা ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করা হয় আর এই গান-বাজনা ও মাদকদ্রব্য সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’।[৬] রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন’।[৭]

র‍্যাগ-ডে চলাকালীন নানা ধরনের যে গান-বাজনা বাজানো হয়, তাতে আশেপাশের মানুষদের নানা ধরনের কষ্ট হয়ে থাকে। নবী করীম ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না’।[৮]

তৃতীয়ত, এর মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ তৈরি হয় এবং যেনা-ব্যভিচারের পথ উন্মোচিত হয়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘দু’চোখের যেনা হলো দৃষ্টিপাত করা, দু’কানের যেনা হলো শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা হলো কথোপকথন করা, হাতের যেনা হলো স্পর্শ করা, পায়ের যেনা হলো হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যেনা হলো আকৃষ্ট ও বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে’।[৯]

এছাড়াও সেখানে মেয়েদের দেখা যায় ইসলাম পরিপন্থী ওয়েস্টার্ন পোশাক পরতে। অথচ তাদেরকে আপাদমস্তক ঢেকে বের হতে বলা হয়েছে।[১০]

আল্লাহ আমাদের এসব ফেতনা থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০।
৭. বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৪৫০৩।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৬।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৭।
১০. দ্রষ্টব্য: সূরা আল-আহযাব, ৩৩/৫৯।

রোগ-ব্যাধি : ক্ষেত্র বিশেষে আপনিই দায়ী!

-সাঈদুর রহমান*

সুখে থাকতে চায় না, এমন কেউ আছে? জানি, কেউ নেই। সবাই সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদে থাকতে পছন্দ করে। সুখের হাতছানি পাওয়ার জন্য মানুষ দেশ-বিদেশ হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করে। সুখের জন্য মানুষ কী না করতে পারে? সবই করতে পারে; কোনো পাপকেই আমলে নেয় না, এমনকি পরের গলায় অস্ত্রধারণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সবার একই বাসনা, আমাকে সন্তানাদি নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে হবে; তা যেভাবেই হোক না কেন! কখনো কখনো মানুষের সুখময় জীবনে চলে আসে বিষাদের ঘনঘটা; কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না, কাছের মানুষগুলোকে দেখলেও বিরক্তি আসে, সবসময় একা-একা থাকতে ভালো লাগে।

আপনি জানেন কি এই সুখময় জীবন কেন বিষাদময় হয়ে উঠে? এর অনেকগুলো কারণ আছে; অন্যতম কারণ হলো শরীরে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি বাসা বাঁধা ও পার্থিব জীবনে বিপদাপদ চলে আসা। আল্লাহ তাআলা যেহেতু মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি জানেন কীভাবে মানুষ চললে সুস্থ থাকবে। আর এজন্যই তিনি কিছু বিধিনিষেধ নির্ধারণ করেছেন। মানুষরা না বুঝে আল্লাহর সেই বিধিনিষেধে হস্তক্ষেপ করে, যার ফলশ্রুতিতে তাদের শরীরে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলম, অবিচার, রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দিতে চান না; কিন্তু বান্দারা তা নিজ হস্তেই উপার্জন করে। তিনি বলেন, ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ‘জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় আপতিত হয়ে থাকে, তা মানুষের হাতের উপার্জন। যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এ জন্য তিনি তাদেরকে তাদের অকর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করান’ *(আর-রূম, ৩০/৪১)*।

আজকের লেখাটা হবে রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে। কিছু রোগ-ব্যাধি আছে, যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দিয়ে থাকেন। আর কিছু আছে, যা বান্দার অপকর্মের কারণে দিয়ে থাকেন। আমরা আলোচনা করব ঐ সমস্ত রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে, যা বান্দার অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে আপতিত হয়ে থাকে। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবে যে, আপনি তো চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করেননি, তাহলে রোগ-ব্যাধি নিয়ে কীভাবে লেখালেখি করবেন? উত্তরে আমরা বলবো, দৈনিক *নয়া দিগন্ত* পত্রিকাতে অনেক প্রথিতযশা চিকিৎসক লেখালেখি করেন, সেখান থেকে আমরা কিছু উল্লেখ করব; নিজ পক্ষ থেকে নয়। কারণ আমরা তো চিকিৎসক নই। আর কালক্ষেপণ না করে শুরু করা যাক ‘রোগ-ব্যাধি’ যাত্রা।

মহিলাদের ক্যান্সার হওয়ার কারণ :

বর্তমানে সারা বিশ্বে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে; কোনোভাবে কমছে না এর প্রকোপ। ছোট-বড়, নর-নারী ও তরুণ-তরুণী কেউ এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এখন আপনাদের কাছে *নয়া দিগন্ত* পত্রিকার একটি রিপোর্ট উল্লেখ করব, যেখানে সারা বিশ্বে প্রতিবছর কতজন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তার একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১৮ লাখের বেশি নারী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। প্রতি ১৩ মিনিটে ১ জন আর বছরে ৪০ হাজার নারী এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২২ থেকে ২৫ হাজার নারী এ রোগে আক্রান্ত হয়, যার মাঝে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় ১৭ হাজার। এ রোগে আক্রান্ত ৫০ শতাংশ রোগীর বয়স ৩০ থেকে ৪০ এবং ৫ শতাংশের বয়স ৩০ বছরের কম।[১]

নারীদের সাধারণত দু’টি ক্যান্সার হয়ে থাকে। স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সার। বিশেষজ্ঞ মহল স্তন ক্যান্সার হওয়ার কারণ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা বলেন, ‘স্তন ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, শিশুকে স্তন থেকে দুগ্ধপান না করানো’।[২] সাধারণত সন্তান প্রসব করার পর নারীদের স্তনে দুধ আসে। এখন কোনো নারী যদি এই দুধ তার সন্তানকে পান না করিয়ে বাজারের কৌটার দুধ পান করায়, তাহলে তার স্তনে জমে থাকা দুধে পচন ধরে সেখান থেকে জীবাণু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আস্তে আস্তে তা রূপ নেয় মরণব্যাধি ক্যান্সারে। বর্তমানে নারীরা ঠুনকো অজুহাতে সন্তানকে বুকের দুধ পান করায় না, যার কারণে বাচ্চারা যেমন বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে; অনুরূপ নারীরাও ক্যান্সার নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২২ অক্টোবর, ২০১৮।

২. প্রাগুক্ত।

তাহলে বলুন, এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধির জন্য দায়ী কে? আল্লাহ তাআলা, না-কি নারীরা? আল্লাহ তাআলা দুধ পান করানোর গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 'দুধপানকারিণীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে; এটা তার জন্য, যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' *(আল-বাক্বারা, ২৩৩)*। নবী ﷺ দুধ পান করানোর বিষয়টা অনেক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ছেলে ইবরাহীম যখন মারা যায়, তখন তিনি বলেন, إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ 'তাঁর জন্য তো জান্নাতে একজন দুধ-মা রয়েছেন'।[৩] রাসূল ﷺ-এর ছেলে ইবরাহীম ১৮ মাস হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। যেহেতু শিশুরা ২৪ মাস অর্থাৎ দু'বছর দুধ পান করে আর ইবরাহীম মাত্র ১৮ মাস দুধ পান করেছে, সেহেতু বাকি ৬ মাস পূর্ণ করার জন্য জান্নাতে তার জন্য দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হবে।

সুধী পাঠক! দুধ পান করানোর গুরুত্ব কতটুকু আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? বর্তমানে নারীরা ঠুনকো অজুহাতে দুধ পান করায় না। এতে যা সমস্যা হওয়ার তা আপনাদেরই হবে। আরেকটি হাদীছ দেখুন—

'গামিদ গোত্রের এক নারী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেন, ফিরে যাও। তিনি ফিরে চলে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি আবার তাঁর নিকট এসে বললেন, আপনি যেরূপ মা'এয ইবনু মালেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত আমাকেও সেরূপ ফিরিয়ে দিতে চান। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই গর্ভবতী। তিনি এবারো তাকে ফিরে যেতে বললে তিনি চলে গেলেন। পরদিন তিনি পুনরায় আসতেই নবী ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও যতক্ষণ না সন্তান প্রসব কর। তিনি ফিরে গেলেন। যখন তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন, তখন সেই শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে বললেন, আমি এই শিশুটিকে প্রসব করেছি। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অবশেষে দুধ ছাড়ানো হলে শিশুটিকে নিয়ে তিনি হাযির হলেন। শিশুটি খাদ্য হাতে নিয়ে খাচ্ছিল। তিনি একজন মুসলিমকে তার ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য গর্ত খনন করতে আদেশ দিলে তা খনন করা হলো এবং পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলে তাকে এভাবে হত্যা করা হলো। তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ছিলেন। তিনি তাকে পাথর মারলে এক ফোঁটা রক্ত ছিটকে এসে তাঁর গালে পড়তেই তিনি তাকে গালি দেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, হে খালেদ! থামো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার কসম! সে এরূপ তওবা করেছে যে, কোনো যালেম কর আদায়কারীও যদি সেরূপ তওবা করত, তাহলে অবশ্যই তাকে মাফ করা হতো। অতঃপর তাঁর আদেশে তার জানাযার ছালাত পড়া হয় এবং তাকে দাফন করা হয়।[৪]

উক্ত হাদীছে নবী ﷺ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তা মহিলাকে সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অবকাশ দেন। তাহলে বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। আর আপনি সাধারণ অজুহাতে বাচ্চাকে দুধ পান করানোর বন্ধ করে দিয়েছেন! রোগ আপনার না হলে কার হবে? অনেক মহিলার কাছ থেকে শোনা যায় যে, ছেলে-মেয়েরা নাকি কথা শুনে না। আমরা বলব, কীভাবে শুনবে; আপনি তো তাদের দায়িত্ব যথোচিত আদায় করেননি। সন্তানকে যদি দুধ পান করাতেন, তাহলে সে আপনার একটি অঙ্গ সদৃশ হতো। আপনার হাত কি কোনো দিন আপনার বিরোধিতা করেছে? না, করেনি। কারণ হাত তো আপনার অঙ্গ। অনুরূপভাবে সন্তান যদি আপনার দুধ পান করে বেড়ে উঠে, তাহলে কখনো সে আপনার বিরোধিতা করবে না। কারণ সে তো আপনারই অংশ।

আমরা পূর্বে বলেছি যে, নারীদের সাধারণত দু'টি ক্যান্সার হয়, স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সার। স্তন ক্যান্সারের আলোচনা আমরা করেছি। এখন হবে জরায়ু ক্যান্সার নিয়ে কথা। ব্যভিচার এমন একটি পাপ— যা ধর্ম, বর্ণ, শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সবাই অপছন্দ করে। আর এই ব্যভিচারই হলো জরায়ু ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ। একজন নারী যখন একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহবহির্ভূত অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়, তখন আস্তে আস্তে ঐ নারীর জরায়ুতে জীবাণু একত্রিত হয়ে সেখান থেকে ক্যান্সার নামক মরণব্যাধির উত্থান হয়। আর এর পতন হয় মহিলার জীবন নাশের মাধ্যমে। এখন যে আপনি ব্যভিচার করছেন, যার কারণে আপনার জরায়ু ক্যান্সার হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চই আপনি। আপনার

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮২।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৪৪২।

যেন এই ক্যান্সার না হয়, এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, ব্যভিচারের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য। এখন আপনার উচিত, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর তা না করে উল্টো আপনি আল্লাহর সাথে ঔদ্ধত্য পোষণ করছেন? আপনাকে ভালো কথা বললেও আপনি রাগ করেন? আপনি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, না-কি উম্মাদ? সুস্থ মানুষ হলে তো নিজের কল্যাণ বুঝতে পারতেন।

পুরুষের ক্যান্সার হওয়ার কারণ :

বিশেষজ্ঞ মহল পুরুষের ক্যান্সার হওয়ার কারণগুলো উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা বলেন, ‘পুরুষের ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ হলো মাদকদ্রব্য সেবন’। এ ব্যাপারে তারা বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য সেবনের একটি জরিপও উল্লেখ করেছেন— বাংলাদেশ তামাকদ্রব্য সেবনে বিশ্বের সাতটি দেশের মাঝে অন্যতম। আগে শুধু গরীব, দুঃখী ও গ্রামের লোকেরাই বিড়ি-সিগারেট সেবন করত। বর্তমানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই সিগারেট পান করে। এমনকি তরুণীদের মাঝেও এর প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি ১০ জনের মাঝে ৪ জন ধূমপায়ী। তামাকদ্রব্যসেবীর সংখ্যা অন্তত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। দিনদিন এর প্রবণতা গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে প্রতি বছর ৩০ হাজার মানুষ ক্যান্সার নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে; কোনোভাবেই এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞ মহল বলেন, ‘প্রত্যেকটা দ্রব্যের কর ধরা হয় চড়া মূল্যে; কিন্তু মাদকদ্রব্যের কর ধরা হয় একেবারে সীমিত, যার কারণে এর প্রবণতা হু-হু করে বাড়ছে’।[৫]

আপনি জানেন, কেন তরুণদের উপদেশে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না? কারণ তারা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে। আর এগুলো সেবন করলে তনু-মনে আবরণ পড়ে যায়। যার কারণে ব্যক্তির মাঝে উপদেশের কোনো প্রভাব পড়ে না। এখন আপনি বলুন, এই ক্যান্সারের জন্য দায়ী কে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ মানুষের কল্যাণ চান। আর এজন্যই তাঁরা নেশাদায়ক বস্তু পরিহার করতে বলেন। আল্লাহ কত সুন্দর কথা বলেছেন, ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, আর নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ো না। অনুগ্রহ করো, নিশ্চই আল্লাহ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহশীল’ *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

আল্লাহ কখনই মানুষের অকল্যাণ চান না, বরং তিনি চান তারা শান্তিতে থাকুক। নেশার মাঝে কখনই শান্তি নেই, যদিও সেবনকারীরা মনে করে এতে শান্তি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের শান্তিটা মরীচিকার ন্যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মনে করে সুপেয় পানি, আসলে তা পানি নয়। অনুরূপভাবে নেশাখোররা মনে করে নেশা করে কষ্ট-যাতনা ভুলে থাকবে; কিন্তু হিতে বিপরীত হয়, কষ্ট আরো বেড়ে যায়। মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। কত নারী যে প্রিয়তম স্বামীর সংসার ছেড়েছে এই সর্বগ্রাসী মাদকদ্রব্যের কারণে তার ইয়ত্তা নেই! ভাই ভাইয়ের মাঝে, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে কত আপনজনের সাথে শত্রুতার। শয়তান তো চায়ই মানুষের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষের সূত্রপাত ঘটাতে। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করার জন্যই নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ‘মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তো শয়তান তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষের সূত্রপাত ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে বিমুখ করতে চায়; তোমরা কি বিরত থাকবে না?’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯১)*। পুরুষের ক্যান্সার হওয়ার আরেকটি কারণ হলো পর নারীর সাথে অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়া।

সুধী পাঠক! মরণব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে অবৈধ যৌনাচার থেকে দূরে থাকতে বলছেন। আল্লাহর কোনো লাভ-ক্ষতি নেই, যদি আপনি তাঁর কথা না শুনেন; কিন্তু আপনার ক্ষতি আছে। চিকিৎসকগণ বলেন, ‘কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর সাথে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে ঐ নারীর যৌনাঙ্গ থেকে পুরুষের যৌনাঙ্গে সংক্রমণ স্থানান্তরিত হয়ে এইডস ও ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধিতে পুরুষ আক্রান্ত হয়’।[৬] এখন আপনার ইচ্ছা, আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

৫. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

৬. প্রাগুক্ত।

নারী-পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ :

জীবনের বড় একটি হতাশা ও ব্যর্থতা হলো সন্তান জন্মদানে অপারগতা। প্রতিটি মানুষের বাসনা থাকে আমার সন্তান প্রথিতযশা বিজ্ঞ পণ্ডিত হবে; কিন্তু সবাই কি সফলতা লাভ করতে পারে? না, সবাই সফল হয় না। এই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই একপর্যায়ে পাড়ি জমাতে হয় পরপারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ ‘আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা ছেলে দেন ও যাকে ইচ্ছা মেয়ে দেন এবং কাউকে ছেলে-মেয়ে উভয়টি দেন আর কাউকে রাখেন বন্ধ্যা করে। নিশ্চই তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাধর’ *(আশ-শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

মানুষের কিছু অনুচিত হস্তক্ষেপের কারণে নেমে আসে তাদের উপর মহা মুছীবত। এই মুছীবতের মাঝে অন্যতম হলো ‘বন্ধ্যা’ হওয়া। প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাক্তার এম.এ. রাজ্জাক বলেন, ‘নারী বন্ধ্যাত্বের কারণ হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ ট্যাবলেট সেবন করা’।[৭] আমি অনেক নবদম্পতিকে দেখেছি, তারা দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে বিশেষ সময় কাটানোর লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ট্যাবলেট সেবন করেছে; তাদের পরিণতি শুভ হয়নি। এখন পর্যন্ত তাদের সন্তান হয়নি। অনেক দৌড়ঝাঁপ হয়েছে, কোনো কাজেই আসেনি। ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যাওয়ার পর যেমন মায়াক্রন্দন ফলপ্রসূ হয় না, তেমনি সন্তান প্রজননের সময় অতিক্রান্ত করার পর আফসোস করে কোনো লাভ নেই।

সুধী পাঠক! সন্তান দান করার মালিক আপনি? কেন আপনি এই দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হয়েছেন? আপনি যদি শুরুতে এই ট্যাবলেট সেবন না করতেন, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার সন্তান হতো। যমীনে পোকামাকড় নিধনে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। আপনি তো আপনার স্ত্রী-নামক যমীনে কীটনাশক প্রয়োগ করেছেন, কীভাবে সন্তান হবে? সন্তান প্রজননের সবকিছু তো মারা গেছে। ইসলাম শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে গর্ভরোধের অনুমতি দিয়েছে আর আপনি শুরুতেই গর্ভরোধ আরম্ভ করেছেন? এখন সারা জীবন সন্তানহীনতার গ্লানি নিয়ে আফসোস করতে থাকুন!

আপনি তো টিভিতে বারবনিতা মেয়েদের অ্যাড দেখে এ কাজ করেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথা তো শুনেননি। পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ হলো বিলম্বে বিয়ে করা ও পর নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে শুক্রাণু নষ্ট করে ফেলা। নবী করীম ﷺ বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَه وِجَاءٌ ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছওম পালন করে। কেননা ছওম তার যৌনতাকে দমন করবে’।[৮]

সুধী পাঠক! উক্ত হাদীছে নবী করীম ﷺ যুবকদের বিয়ে করতে বলেছেন। আর যুবক বলা হয় ১৫ থেকে ৩০ বা ৩৩ বয়সের লোকদের; এরপরে ৪০ পর্যন্ত বয়সকে বলে পৌঢ়ত্ব, ৪০ থেকে মৃত্যু অবধি বয়সকে বলে বৃদ্ধ।[৯] সন্তান যেন বেশি জন্মগ্রহণ করে এজন্য নবী ﷺ আপনাকে বলেছেন, যুবকাবস্থায় বিয়ে করতে আর আপনি বিয়ে করছেন ৩০ বা ৩৫ বয়সের ঊর্ধ্বে; আপনার কীভাবে সন্তান হবে? ডাক্তাররা বলেন, ‘৩০ ঊর্ধ্বে বয়স হলে শুক্রাণু ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে’।

এখন বলুন, বন্ধ্যা হওয়ার জন্য দায়ী কে? ইসলাম থেকে যতদূরে যাবেন, আপনার ক্ষতি ততবেশি হবে। তাই নিজেকে সুস্থ-সবল রাখতে ইসলামের দেওয়া অনুশাসনের গণ্ডিতে থাকা উচিত। কারণ আপনাকে তো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা। আর তিনি ভালো করেই জানেন কীভাবে চললে মানুষ সুস্থ থাকবে। একটি আয়াত উল্লেখ করে লেখার ইতি টানছি, ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ‘রাসূল যা আদেশ করেন তা মান্য করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চই তিনি শাস্তি দানে কঠোর’ *(আল-হাশর, ৫৯/৭)*।

৭. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৭ অক্টোবর, ২০১৮।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৬।

৯. ফাতহুল বারী, ১২তম খণ্ড, হা/৫০৬৬।

বিবাহের ব্যবস্থা করুন!

*-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ**

ভূমিকা :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 'আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী' *(আন-নূর, ২৪/৩২)*।

'বিবাহ' একটি পবিত্র শব্দ। যা মানুষকে অশ্লীল ও হারাম কাজ থেকে হেফাযত করতে সাহায্য করে। আমার এই ছোট্ট জীবনে আমি কতক যুবক/যুবতীর গল্প জানি, যারা বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। চায় তারা ফেতনাযুক্ত পরিবেশে নিজের ঈমান রক্ষা করতে; চায় আত্মতৃপ্তি লাভ করতে; ভোগ করতে চায় আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত; কিন্তু তাদের এই অতি চমৎকার সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক। ভুক্তভোগীদের ব্যথায় সমব্যথিত হয়ে আজকের এই লেখার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। ড

প্রাপ্ত বয়সে যৌবনের চাহিদা :

প্রাপ্ত বয়সে যৌবনের চাহিদা দমন করা খুবই কষ্টকর। এই বয়সে যুবক/যুবতীরা বিবেকশূন্যে নিমজ্জিত হতে থাকে। আর তখনই ভুলে যেতে থাকে মান-সম্মানের কথা; জড়িয়ে পড়ে অশ্লীল ও পাপকর্মের সাথে। যা কেবল ভুক্ত-ভোগীরাই বুঝতে পারে।

সম্মানিত অভিভাবক! তবে কি জানেন? নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারে তারাই, যারা খুব আল্লাহভীরু। আল্লাহর ভয়ই তাদেরকে শান্ত শিশুর ন্যায় করে রাখে। আর তাদের কষ্ট আল্লাহ ব্যতীত আমরা বুঝার তেমন ক্ষমতা রাখি না। আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলো— আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতের এত সব নেয়ামত পেয়েও নিজেকে পরিপূর্ণ সুখী মনে করতে সঙ্গীর অনুভব করেছিলেন। একজন নবী যদি জান্নাতী পরিবেশে সঙ্গী ছাড়া জীবন শূন্যতা অনুভব করেন, তাহলে আপনি দুনিয়ায়...? তাই আপনি আদম আলাইহিস সালাম-এর কথা স্মরণ করুন। আপনার সন্তানের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কেননা সন্তান আপনার, দায়িত্বও আপনার।

সন্তান বড় বা ছোটোর হিসাব করা নিষ্প্রয়োজন :

সম্মানিত অভিভাবক! বিবাহের ব্যাপারে ছোট কিংবা বড় এটা কোনো ব্যাপার না। ইসলাম এ বিষয়ে কিছু বলে না। বরং সন্তান বালেগ (প্রাপ্ত বয়স) হলে এবং তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন থাকলে অভিভাবকের উচিত হবে, তাকে সেই পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে সমর্থন ও সাহায্য করা। তাছাড়া সবার চাহিদা সমান না। যৌবনকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো বেশি, কারো বা কম। আবার কারো যৌবনের চাহিদা বেশি থাকে, কারো কম থাকে। সুতরাং সন্তানের উপর ব্যক্তি বা সমাজের বোঝা চাপানো উচিত হবে না।

সম্মানিত অভিভাবক! যে সন্তানকে আপনি ছোট বলছেন, তার সম্পর্কে একটু গভীরভাবে ভাবুন এবং তার সম্পর্কে নিবিড়ভাবে খোঁজ-খবর রাখুন। আর সম্ভব হলে নিজেকে নিয়ে তুলনা করুন কত বছর বয়সে আপনার মধ্যে যৌবন এসেছিল? কত বছর বয়সে আপনি বিবাহ করেছেন? নিশ্চয়ই ১৩-১৪ কিংবা ১৭-১৮ হবে হয়তো। আপনার যদি ফেতনামুক্ত পরিবেশে ১৩ কিংবা ১৭ বছর বয়সে বিবাহের প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ফেতনাযুক্ত পরিবেশে এই বয়সের সন্তানদের আপনি ছোট বলেন কীভাবে?

বিদ্যা অর্জন ফ্যাক্ট :

অধিকাংশ পিতা-মাতাই সন্তানকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করানোর স্বপ্ন নিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে নেমেছেন। না, আমি বিদ্যা অর্জন করার বিপক্ষে কলম ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাচ্ছি না। আসলে বলতে চাচ্ছি, বিদ্যা আগে নাকি ঈমান? নিশ্চয়ই 'ঈমান' বলবেন, নয় কি? যদি তাই হয় তাহলে সন্তানের ঈমান রক্ষায় তার বিবাহ দিন। অতঃপর পড়ালেখা করান। এতে ঈমান, সাথে সাথে বিদ্যা দুটোই ঠিক থাকবে ইনশা-আল্লাহ।

সন্তান-হিতৈষী পিতা-মাতা :

প্রত্যেকটা পিতা-মাতাই চান সন্তানের কল্যাণ। তবে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী। যেমন—একজন চিত্রনায়ক-নায়িকার পিতা-মাতা চান যে, তার ছেলে বা মেয়ে যেন বিশ্বের সেরা

---

* কাটলাহাট, বিরামপুর, দিনাজপুর।

চিত্রনায়ক-নায়িকা হয়। তারাও কিন্তু তাদের জ্ঞান অনুযায়ী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। যদিও তারা প্রকৃত কল্যাণ ধরতে পারেন না। আপনার বুঝটাও তো এমন হতে পারে।

একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে— মনে করুন, এক ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে কোনো কারণে অনাহারে আছেন। অবস্থা একেবারেই শোচনীয়; প্রাণ যায় যায় অবস্থা। খাদ্য গ্রহণ করা তার জন্য অতীব জরুরী। বিষয়টি তার স্ত্রী অবগত হলেন। তিনি স্বামীকে অত্যধিক ভালোবাসার কারণে যেনতেন খাবার অসুস্থ স্বামীর সামনে উপস্থিত করতে চান না। তাই তিনি কোরমা-পোলাও রান্না করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্ত্রীর এত ভালোবাসা দেখে, নিশ্চয়ই অনেক সন্তুষ্ট হবেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা অনেক গুণ বেড়ে যাওয়ার কথা, তাই নয় কি? কিন্তু লোকটির রাগ হলো। আসলে তিনি কোরমা-পোলাও খাওয়ার অপেক্ষায় জীবন দিতে চাচ্ছেন না; চাচ্ছেন একটু জীবন বাঁচার জন্য খাবার। এক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসেন না, বিষয়টি এমন না। আসলে তিনি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বুঝতে পারেননি যে, পেট খারাপের ওষুধ 'নাপা' না।

আপনার সন্তানের বিষয়টিও তো এরকম হতে পারে। হতে পারে আপনি তার মঙ্গলটা ধরতে পারছেন না। সন্তানকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

উলামায়ে কেরামের জন্য লক্ষণীয় :

বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে বই এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পাওয়া গেলেও 'বিবাহের ব্যবস্থা' সম্পর্কে তা খুবই সীমিত। অথচ আজকের সমাজে যেনা-ব্যভিচার ও অশ্লীলতার যত কারণ আছে, তন্মধ্যে বিবাহ দেরিতে দেওয়া কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং উলামায়ে কেরাম তথা যারা দ্বীনের দাওয়াত প্রচার নিয়োজিত আছেন তাদের উচিত হবে, মানুষের মাঝে বিবাহ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস বিরাজ করছে তার মূলোৎপাটন করার চে ষ্টা করা। সাথে সাথে জাতির সামনে বিবাহের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং উৎসাহ প্রদান করা।

উপসংহার :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন তাদের মাঝে যৌবন। আর এই যৌবন বিবাহ ব্যতীত নিবারণ করা হারাম। তাই আসুন! আমরা হারামকে বিবাহের মাধ্যমে হালাল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিবাহের প্রতি যত্নশীল হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উলুমুল কুরআন মহিলা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা

স্থাপিত: ২০২১ ইং

ভর্তি চলছে

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বিভাগ সমূহ

★ নূরানী ★ নাজেরা ★ হিফজুল কুরআন
★ জেনারেল শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত

বৈশিষ্ট্য সমূহ

★ উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলেম ও হাফেয দ্বারা পাঠ দান।
★ মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখা প্রাদান
★ আরবীর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে সমান পারদর্শী করা।
★ বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীছ মুখস্থ করানো। সাপ্তাহিক বক্তৃতা, ক্বেরাত ও কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শেখানো।
★ স্বাস্থ্যসম্মত, সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা এবং মহিলা শিক্ষক দ্বারা সার্বক্ষণিক তদারকি।

পরিচালক

শায়খ রেজাওয়ান বিন আলতাফ (দাওরায়ে হাদীছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী)

যোগাযোগ: ০১৯৫৭-৮১৫৪৬৮ স্থান: বোনারপাড়া কলেজ মোড় হতে ৩০ গজ পশ্চিমে, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

আল্লাহর উপর ভরসা

প্রত্যেক নেক্কার মানুষের মাঝে কিছু বিশেষ গুণ থাকে। এই গুণগুলো রপ্ত করতে পারলে সুখের সবচেয়ে বড় দরজাটি আমাদের জন্য খুলে যায়। তেমনি একজন নেককার মানুষ ছিলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ, যার মন ছিল তার রবের প্রতি আস্থায় পরিপূর্ণ। একবার তিনি কিছু বিদআতীর সাথে তর্কের সময় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা দেখিয়েছিলেন। বিদআতীরা ওই সময় খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তারা নানা ধরনের ছলচাতুরী করে মানুষদের ধোঁকায় ফেলতে পারত। আগুনের মধ্যে হেঁটে তারা মানুষকে অবাক করে দিত। ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ তাদের প্রতারণা বুঝতে পারলেন। এগুলো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না, বরং তারা বিভিন্ন পদার্থ মেখে আগুনের মধ্যে হাঁটত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবস্থা বেগতিক দেকে ইবনু তায়মিয়া তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন। বিতর্কের উত্তেজনা চরম আকারে পৌঁছল। বিতর্ক সেদিনের জন্য স্থগিত করা হলো। পর দিন দুই পক্ষ আবার তর্কে অংশ নিলো। সেদিনের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সে দিন আমি ইস্তিখারা ছালাত আদায় করলাম এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে সহযোগিতা করুন এবং সৎ পথ দেখান। আমি বারবার আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম। আমার মনে হলো আমাকে আগুনে নামতে হলে আমি তাই করব। আল্লাহ যদি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে আগুন থেকে রক্ষা করেন, তাহলে আমাকেও তাই করবেন। পর দিন বিতর্ক শুরু হলো। একসময় প্রতিপক্ষ বলে দিল আমরা আগুনের মধ্যে হাঁটতে পারি। ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেই দিলেন যে, 'আমিও আগুনে হাঁটতে পারি। এই শর্তে প্রতিপক্ষ রাজি হয়ে গেলো। কিন্তু ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ শর্ত জুড়ে দিলেন, সবাইকে নিজের শরীরে গরম পানি আর সিরকা মাখাতে হবে। প্রতিপক্ষের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেলো। ইবনু তাইময়া রহিমাহুল্লাহ বারবার শর্ত জুড়ে দিতে লাগলেন এবং সবাই পালাতে লাগল। আর দর্শকরা খুশিতে এই আয়াত পড়ল, ﴿فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ 'তাই সেখানে তারা পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত হলো' *(আল-আ'রাফ, ৭/১১৯)*।

দেখুন, ইমাম ইবনে তায়মিয়া কীভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন। আল্লাহর উপর তাঁর ঈমান কেমন ছিল।[১]

শিক্ষা : আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে যে কোনো বড় সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ক্ষমতাধর খারাপ লোককে প্রতিহত করা সহজ হয়। ঈমান শক্তিশালী হয়। জীবন সুন্দর হয়, সুখের হয়। অপরদিকে মিথ্যার আশ্রয় নিলে সবদিক থেকে বিপদ চেপে ধরে।

-আব্দুল আহাদ আল-লাবীব
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

গরীবের উপকার

একদা আমার আম্মু আমাকে টিফিন সহকারে স্কুলে পাঠালেন। পথিমধ্যে আমি খুবই কষ্টদায়ক একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম। তা হলো— এক গরীব বৃদ্ধা মহিলা তার ছেলেকে পড়াশুনার জন্য অনেক দূরে পাঠাবেন। কিন্তু ছেলেটাকে কী খাওয়ায়ে পাঠাবেন, তা নিয়ে তিনি খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ তার কাছে তখন কোনো খাবার ছিল না। বৃদ্ধা মহিলাটি তার কয়েক প্রতিবেশির কাছে গেলেন। কিন্তু তাদের কাছে খাবার থাকা সত্ত্বেও তারা খাবার দিলো না। আমি এতে খুব কষ্ট পেলাম এবং আমার টিফিন উনাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার সন্তানকে তা খাওয়ালেন এবং আমার জন্য দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্বইম মান আত্বআমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী। **অর্থ :** হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন।[২]

অতঃপর ছেলেটি পড়াশুনার উদ্দেশ্যে বের হলো। দীর্ঘ ১০ বছর পর দেশে ফিরে আসলো এবং একটা ভালো চাকরি পেল। একদিন আমি খুব বিপদে পড়লাম। তখন আমার কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ আমি পথে সেই মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমি উনাকে সালাম দিলাম। মহিলাটির গায়ে সেদিনের মতো ছেঁড়া পোশাক নেই। সবকিছু ছিল নতুন এবং দামী। মহিলাটি আমাকে ব্যস্ত এবং চিন্তিত দেখে বললেন, তোমার নাম কী, মা? আমি আমার নাম বলার পর মহিলাটি আমাকে চিনতে পারলেন এবং আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি কারণটি বলার পর মহিলাটি আমাকে বললেন, একদিন তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে। তাই আজ তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। তারপর মহিলাটি আমার প্রয়োজন মতো সাহায্য করলেন আর আমিও বিপদমুক্ত হলাম। আল-হামদুলিল্লাহ।

শিক্ষা : অন্যের উপকার করলে আল্লাহ তাকে যে কোনোভাবে হোক সাহায্য করবেন ইনশা-আল্লাহ।

-মা'রূফা বিনতে মীযানুর রহমান
ছাত্রী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. হায়ছাম ক্বাসেম, আল-মুনাযারাত আল-আক্বাদিয়্যাহ লিশাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১১৬-১১৭।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৫৫।

কার হুকুমে

-জিশান মাহমুদ
শ্রীবরদী, শেরপুর।

কার হুকুমে সূর্য উঠে
কার হুকুমে চাঁদ,
কার হুকুমে আলো আঁধার
দিনের পরে রাত?
কার হুকুমে উষার আলো
ফুটে পুব আকাশে,
কার হুকুমে গাছের পাতা
নড়ে যে বাতাসে?
কার হুকুমে ফুল ফুটে আর
পাকে নানা ফল,
কার হুকুমে খালে-বিলে
গড়ায় নদীর জল?
কার হুকুমে পাখিরা সব
নীলাকাশে উড়ে,
কার হুকুমে পাহাড়গুলো
দাঁড়িয়ে রয় দূরে?
সুখে-দুঃখে তাঁরই তরে
জানাই ফরিয়াদ
তিনি হলেন দয়ার সাগর
আল্লাহ মহান রব।

বাবা তুমি!

-মাযহারুল ইসলাম আবির
নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

বাবা তুমি এই ধরণির ভিন্ন এক মানুষ
শুধু তুমি বাবা নওকো, তুমি বীরপুরুষ।
মাথার উপর বটগাছ তুমি, ছায়া দাও আমায়
তুমি তো আছো কেউ না থাকলে কী আসে-যায়!
তোমার হাতে হাত রেখে চলেছি কত পথ?
জীবন দিয়ে দিলেও বাবা, শোধ হবে না তার ক্বীমত।
কত কষ্ট সহেছো বাবা আমারই জন্যে?
দুর্বিষহ হতো জীবন তুমি না থাকলে।
তোমার কাছে খুলি বাবা আবদারের ঝুলি
যত আছে চাওয়া-পাওয়া সবই তোমায় বলি।
কখনো তুমি ফেরায় দাও না, পূরণ কর সব
বাবা তোমায় ভালো রাখুক মহান প্রিয় রব।
আমার কল্যাণে বাবা তুমি সদা সচেষ্ট
বুকের গর্তে পুতে রাখো আমার দেয়া শত কষ্ট।
মাফ করে দিও বাবা যত দিয়েছি ব্যথা
আদর দিয়ে ভরিয়ে দিও আমার জীবনখাতা।
বাবা তুমি চির-আপন, সুখ সুরের বাঁশি,
সত্যিই বাবা তোমায় আমি বড্ড ভালোবাসি।

জাগো সাফল্যের পথে

-ইবরাহীম সরকার
মাহাদ ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

গ্রন্থে সার্বভৌমের বাণী
সরল লিপির বিবরণী
ইবাদতে কোটি ধ্বনি।
কী অপূর্ব আর
অবসান নেই যার
শ্রেষ্ঠ ভাষার সমাহার।
ধরণিতে নেই গ্রন্থ এমন
ভ্রান্তি, মুক্ত, দীক্ষা সঞ্চয়ে তেমন
মেটে দীক্ষা দিতে যেমন।
হবে অক্ষম গ্রন্থে ভ্রম পেতে
হক্বকে বাতিলরূপে গণ্যতে
থাকবে কাফেররূপে লেলিহানেতে।
হিতসাধনে আসবে না কেহ
সেদিন মহান গ্রন্থ ব্যতীত,
ফিরে এসো ক্ষমা চাই
হও প্রভুতে মাথা নত।
ধিক্কার জানাও বাতিল কিতাব
এসো রবের গ্রন্থ পড়ি,
নিজে হও শিখে সার্থক মানব
এসো অধমকে সার্থকের আহ্বান করি।

মুসাফির

-সাব্বির আহমাদ
অধ্যয়নরত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট,
উত্তরা, ঢাকা।

তুচ্ছ এ অবনির ক্রোড়ে এসেছি আমি মুসাফির বেশে।
রব পাঠিয়েছে মোরে শুধু তাঁরই আরাধনায়
তাঁকে ভুলে আজ হারিয়ে যাচ্ছি কোথায়?
অকূল দরিয়ার হিল্লোলে যবে হারিয়ে ফেলি কূল
তাঁরই অপার অনুগ্রহের বলে ভেঙে যায় সব ভুল।
ঘনকৃষ্ণ এঁদো রজনিতে অথবা
কুহেলিকার মাঝেও পাই আলোর ফোয়ারা।
কোনো এক হিমভেজা প্রভাতে বা দুঃখময় দিবসে
বিদায় চিঠি অতিথি হয়ে আসবে আমার দ্বারে,
মালাকুল মাউতের আগমনধ্বনি ভেসে আসবে কর্ণকুহরে
হারিয়ে যাব চিরচেনা মেদিনীর বুক চিরে।

ফোন রেখো না হাতে!

-মো. জহুরুল ইসলাম
হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

ফোনের পিছনে ছুটে ছুটে তুমি জীবন করো না নষ্ট
অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারে হয়ে যাবে যে ভ্রষ্ট।
রাস্তাতে হাঁটার সময় ফোন রেখো না হাতে
মনোযোগের অভাবে দুর্ঘটনা ঘটে।
ফোন চালু করে দাঁড়িয়ো না কভু ছালাতে
এ সময় ফোন দিলে কেহ বিঘ্ন ঘটবে ইবাদতে।
ফোন রেখে মন দাও খাওয়াতে
নচেৎ পাবে না তুমি তৃপ্তি কোনোমতে।
পড়ার সময় পাশে রেখো না ফোন
কারণ ঘটাবে বিঘ্ন তা সারাক্ষণ।
ঘুমানোর আগে ফোন হাতে তুমি যেও না কভু বিছানা
সময় ক্ষেপণ হবে ঘুম তাড়াতাড়ি আসবে না।
দিও না বেশি সময় ফেসবুক, টুইটার আর সামাজিক সাইটে
গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে লাগাও নিজের কাজে।
মোবাইলে শুধু চোখ রেখে উপকার নাই সব ক্ষতি
রেডিয়েশনের কবলে হারাবে মস্তিষ্ক, শরীর, চোখের গতি।
প্রয়োজনে ব্যবহার করো ফোন; ফোনের প্রয়োজনে তুমি নও
সময়গুলো কাজে লাগাও যদি সফল হতে চাও।

অভাব

-সাদিয়া আফরোজ
হাজীর হাট কাঁটাবাড়ি মিলবাজার, রংপুর।

অভাব বলা স্বভাব হলো
মানুষের এক রোগ,
যতই থাকুক চাইবে আরও
হতে থাকুক যোগ।
অল্পতে কেউ হয় না তুষ্ট
অভাব ভরা মন,
হাজার নালিশ প্রভুর কাছে
লোভী সারাক্ষণ।
এই পৃথিবী পরীক্ষাগার
থাকবে অভাব বোধ,
এর মাঝেও স্বস্তি দিয়ে
অভাব করো রোধ।
পরকালে জান্নাত পেলে
অভাব রবে না,
পৃথিবীতে অভাব সহে
পরীক্ষা দাও না!
অভাব মেনে নিয়ে বলো
সুখে আছি রব,
পরীক্ষা সহজ করে দাও
তুমি মোদের সব।

হও পর্দানশিন নারী

-সৌরভ হাসান
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

শোনো আমার মা-বোনেরা শোনো দিয়ে মন
বহু হিকমাহ সামনে রেখে তোমাদের পর্দা প্রয়োজন।
পর্দা হলো দ্বীনের বিধান পালন করবে তোমরা তাই
পর্দা ছাড়া নারীর এই সমাজে কোনো মর্যাদা নাই।
তোমরা হচ্ছ নারী মায়ের সমান কত যে সম্মান
পর্দা ছেড়ে আজ তোমরা নারী কেন হচ্ছ অপমান।
পেপার পত্রিকার পাতা খুললে প্রায়ই দেখা যায়
এসিড নিক্ষেপ নারী ধর্ষণ এসব খবর রয়ে যায়।
পর্দা করে চললে নারী পাবে তোমরা সবাব শ্রদ্ধা
বেপর্দা আর বেহায়াপনা ছেড়ে করো তোমরা দ্বীনের পর্দা।

বাংলাদেশ সংবাদ

৮ মাসে ৩৬৪ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

শিক্ষার্থী ও কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মাঝে প্রতিনিয়তই বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। পরীক্ষায় ফেল, প্রেমে ব্যর্থতা, ব্রেকাপ, বাবা-মায়ের সঙ্গে বিবাদ, স্কুলে বকাঝকা, ইন্টারনেটে হয়রানি সবকিছুর সমাধান যেন তারা খুঁজতে শুরু করেছে জীবন সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। মদ্যপায়ীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি। হিরোইনসেবীদের আত্মহত্যার হার সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রায় ১৪ গুণ বেশি। আঁচল ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিমাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ৩৬৪ জন আত্মহননের পথ বেছে নেয় যারা তাদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিলেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদরাসা, নার্সিং প্রভৃতি স্তরের শিক্ষার্থী রয়েছেন। ৩৬৪ জন আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ১৯৪ জনই ছিলেন স্কুলগামী শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন কলেজ শিক্ষার্থীরা যার সংখ্যা ৭৬ জন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহননকারীর সংখ্যা ৫০ জন। তবে মোট আত্মহননকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদরাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীও ছিলেন ৪৪ জন। আত্মহত্যাকারীদের বয়সভিত্তিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, ১৩ থেকে ২০ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, যা ৭৮ শতাংশ। ২১ থেকে ২৬ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ১৩ বছরের নিচে যাদের বয়স, তারাও এই পথ থেকে পিছপা হয়নি। ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ অর্থাৎ ২৯ জন আত্মহত্যা করেন। তবে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করেছে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা, যার সংখ্যা ১৬০ জন। এছাড়াও সর্বনিম্ন ৭ বছরের একটি শিশুও আত্মহত্যা করেছে।

দেশে কম বয়সে হৃদরোগে মৃত্যু বাড়ছে

দেশে প্রতিদিন গড়ে ৭৫৯ জন মানুষ মারা যায় হৃদরোগে। দেশে কম বয়সী হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এই হার ১৭ গুণ বেশি। বাড়ছে অল্প বয়সে মৃত্যুও। অল্প বয়সে ধূমপান, মদ্যপান, কোলেস্টেরল ও চর্বিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, অসচেতনতা ও খাদ্যে অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, ডায়াবেটিস হওয়া এর অন্যতম কারণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এক গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের আরেক গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়, অত্যধিক লবণযুক্ত প্যাকেটজাত খাবারে হৃদরোগী বাড়ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটে হৃদরোগে। ফলে হৃদরোগ শুধু বড়দের নয়, শিশু-কিশোরদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, প্রতিবছর বিশ্বে ১৯ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করে। এই রোগে বাংলাদেশে প্রতিবছর মারা যায় দুই লাখ ৭৭ হাজার মানুষ, যার ২৪ শতাংশের জন্য দায়ী তামাক। গ্লোবাল বারডেন অব ডিজিজ স্টাডি (GBD) ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের প্রধান চারটি কারণের একটি তামাক। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত অসুখে বছরে এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (তিন কোটি ৭৮ লাখ) তামাক ব্যবহার করছে, যা হৃদরোগ পরিস্থিতিকে আরো উদ্বেগজনক করে তুলছে। সাধারণত ৬০ বছর বয়স থেকে প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়; কিন্তু আমাদের দেশে ৩৫ বছরের কম বয়সী অসংখ্য ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। ফলে অপরিণত বয়সে মৃত্যুও বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিহারে ভেসে উঠল ১২০ বছর পুরনো মসজিদ

জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছে বিশ্বজুড়ে। আবহাওয়া উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে কমে যেতে শুরু করেছে পানি। তার ছোঁয়া লেগেছে ভারতের বিহার রাজ্যেও। শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে ১৯৭৯ সালে নির্মিত একটি বাঁধে আটকে রাখা পানি। আর এতে দেখা মিলেছে ১২০ বছরের পুরোনো ছোট্ট একটি মসজিদের। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে পানির নিচে থাকলেও তাতে মসজিদের কোনো ক্ষতি হয়নি। ভারতের বিহার রাজ্যের নওয়াদা জেলার চিরাইলা গ্রামে ফুলওয়ারিয়া বাঁধের পানি খরার প্রভাবে সম্প্রতি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এর আগে যখন পানির স্তর কমে যেত, তখন মসজিদের গম্বুজের একটা অংশ দেখা যেত। ফলে কৌতুহল জাগলেও এটি ঠিক কী জিনিস তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। এবার পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ মসজিদটির দেখা মেলে। মসজিদটি বিংশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়। মুঘল রীতিতে নির্মিত মসজিদটির বয়স এখন প্রায় ১২০ বছর। স্থানীয়রা এ মসজিদের নাম দিয়েছিল নূরী মসজিদ। মাটি থেকে গম্বুজ পর্যন্ত মসজিদের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। ১৯৭৯ সালে এখানে ফুলওয়ারিয়া ড্যাম নির্মাণ শুরু হয়। সে সময় এ এলাকায় প্রচুর মুসলিম বসবাস করত। এ মসজিদে তারা নিয়মিত ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু সরকার বাঁধ নির্মাণ শুরু করলে মুসলিমদেরকে এই জায়গা ছেড়ে উঠে যেতে হয়। সরকার পুরো জায়গাটি অধিগ্রহণ করে গ্রামবাসীকে অন্য একটি গ্রামে স্থানান্তর করে। বাঁধ নির্মাণের সময় প্রয়োজন না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ মসজিদটির কোনো ক্ষতি করেনি। বাঁধের পানি শুকিয়ে গেলেও পুরো এলাকা কাদাময় হয়ে আছে। কিন্তু এরমধ্যে কৌতুহলী

মুসলিমরা কাঁদা মাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করে। তারা দেখতে পান মসজিদটি পুরোপুরি অক্ষত রয়েছে। কয়েক দশক ধরে ডুবে থাকলেও কাঠামোর সামান্যতম ক্ষতি হয়নি।

বিশ্বে ক্ষুধায় প্রতি ৪ সেকেন্ডে একজন মারা যাচ্ছে!

বিশ্বের সাড়ে ৩৪ কোটি (২৪৫ মিলিয়ন) মানুষ ক্ষুধার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের খাদ্যবিষয়ক প্রধান। প্রতিদিন ১৯ হাজার ৭০০ জন ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। সে হিসাবে প্রতি চার সেকেন্ডের মাথায় মারা যাচ্ছে একজন। এ ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধ অন্তত ৭ কোটি মানুষকে ক্ষুধার দিকে ঠেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির (WFP) বলেছে, বিশ্ব এক অভূতপূর্ব জরুরী পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। জাতিসংঘ বিশ্বের ৮২টি দেশে কাজ করে। এসব দেশের সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ এখন তীব্র খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আছে। করোনা মহামারির আগে বিশ্বে যত মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। বিশ্বের ৪৫টি দেশের ৫ কোটি মানুষ অনাহারের দ্বারপ্রান্তে। বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ার পেছনে মহামারি, যুদ্ধ, বৈশ্বিক মন্দা, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

মদীনায় স্বর্ণ ও তামার খনি আবিষ্কার

সঊদী আরবে সন্ধান মিলেছে নতুন সোনা এবং তামার খনি। সঊদী জিওলজিক্যাল সার্ভে (SGS) জানায়, মদীনা শহরের আবা আল-রাহা অঞ্চলের উম্ম আল-বারাক হেজাজে মিলেছে সোনার খনির সন্ধান। একই সঙ্গে ওয়াদি আল-ফারা অঞ্চলের আল-মাদিক এলাকায়ও আবিষ্কৃত হয়েছে চারটি তামার খনি। ভূতাত্ত্বিক সংস্থাটি জানায়, এই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চ্যালকোসাইট (Cu2S) খনিজ। আরও আছে মাঝারি মানের কপার কার্বোনেট খনিজ। বিপুল পরিমাণ তামা, দস্তা, সোনা এবং রূপার মজুত আছে উম্ম আল-দামারে। মদীনায় অবস্থিত এই জায়গাটির আয়তন ৪০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি। সঊদী আরবের বার্ষিক তামা এবং দস্তা কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮ হাজার টন। পাশাপাশি দুই কোটি ৪৬ লাখ টন ফসফেট আকরিক উত্তোলন করা হয় যা দিয়ে ৫২ লাখ ৬০ হাজার টন ফসফেট সার উৎপন্ন হয়। ফসফেট সার উৎপাদনে সঊদী আরব বিশ্বে শীর্ষ পাঁচে অবস্থান করছে। মন্ত্রণালয়ের খনির পোর্টাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, সাইটটির প্রত্যাশিত বিনিয়োগের আকার ২০০ কোটি সঊদী রিয়াল এবং এটি প্রায় ৪ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে। উল্লেখ্য, সঊদী আরবে প্রায় ৫ হাজার ৩০০টি খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধাতু, অধাতু শিলা, নির্মাণ সামগ্রী, আলংকারিক শিলা এবং রত্নপাথর।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত বাইক

জাপানের স্টার্ট আপ সংস্থা তৈরি করল বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত বাইক। যার নাম এক্সটারেসমো হোভারবাইক (Xturismo Hoverbike)। বাইকটির ওজন ৩০০ কেজি, ৪০ মিনিটের জন্য এ বাইক আকাশে উড়তে পারে। ঘণ্টায় ৬২ মাইল পর্যন্ত গতিতে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এ হোভারবাইকের। জাপানি স্টার্টআপ সংস্থা এরউইন্স (Aerwins) তৈরি করেছে এ বাইক। এটি ইতোমধ্যেই জাপানে বিক্রি হচ্ছে। কালো, লাল ও নীল রঙে পাওয়া যাচ্ছে এই বাইক যার আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার। তবে ৫০ হাজার ডলার মূল্যে আরেকটি ছোট হোভারবাইক আনারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই বাইকের ৬টি পাখা রয়েছে। সামনে ও পিছনে ২টি বড় পাখা রয়েছে, যা বাইকটিকে উড়তে ও নিয়ন্ত্রিত হতে সাহায্য করে। ৪টি পেট্রল ইঞ্জিন বাইকটিকে পরিচালিত করে।

জামি'আহ সংবাদ

এজেন্ট সমাবেশ ও সালাফী কনফারেন্সের প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময় সভা

মাসিক আল-ইতিছামের এজেন্ট সমাবেশ ও সালাফী কনফারেন্সের প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় দেশের আঞ্চলিক জেলা শহরেগুলোতে। ঢাকা ও আশেপাশের জেলাসমূহের জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বংশালের সুরিটোলা জামে মসজিদে; রংপুর ও আশেপাশের জেলাগুলোর জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে আল-জামিআহ আস-সালাফিয়্যাহ, তেঘরা, বিরল, দিনাজপুরে; বগুড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সুত্রাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বগুড়ায় এবং রাজশাহী ও আশেপাশের জেলাসমূহের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে এই সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আল-ইতিছামের প্রধান সম্পাদক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, মাসিক আল-ইতিছামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। এছাড়াও মাসিক আল-ইতিছাম ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিপুল সংখ্যক এজেন্ট, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধির ব্যাপারে পরামর্শ, এজেন্টদের সমস্যা ও তার সমাধান, ইতিছামের ব্যাপারে এজেন্টদের বিভিন্ন পরামর্শ এবং পত্রিকার অগ্রগতি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ এর বহুমুখী কার্যক্রম নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আকীদা

প্রশ্ন (১) : মানুষের মত কি জিনদেরও সংসার জীবন ও হায়াত-মউত আছে?

-আনোয়ার হোসেন জসিম
পূর্বধলা, নেত্রকোণা।

উত্তর: কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, জিনদেরও সংসার জীবন আছে। তারাও বিবাহ-শাদী করে, তাদেরও সন্তান-সন্ততি আছে। মহান আল্লাহ জিনদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে বলেন, 'আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট পরিণতি!' (আল কাহফ, ১৮/৫০)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তার মধ্যে (জান্নাতে) থাকবে সতীসাধ্বী সংযত-নয়না (কুমারী)রা, পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর কোন জিন' (আর রহমান, ৫৫/৫৬)। আর প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তাই জিনদেরও মৃত্যু হবে। আল্লাহ বলেন, 'প্রতিটি জীবন মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে' (আলে ইমরান, ৩/১৮৫)। অত্র আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, জিনদেরও সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততি এবং জীবন-মৃত্যু আছে।

প্রশ্ন (২) : ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾। (সূরা আল-আনাম, ৬/১০৩) প্রশ্নটি হলো- আমাদের দৃষ্টি কেন আল্লাহকে দেখতে পারে না?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: আল্লাহর সত্তা অসীম আর মানুষের দৃষ্টি সসীম। দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন সহ্য করার শক্তি মানুষের চোখে নেই। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়ার এই চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। আর বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। যেমন: মূসা আ. আল্লাহ তাআলার দর্শনের আশা ব্যক্ত করে বলেন, ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ 'হে আমার রব! তুমি আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না (আল আরাফ, ৭/১৪৩)। ...এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের উপর তার নূর প্রকাশ করলেন, তা দেখে মূসা আ. বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন (প্রাগুক্ত)। রাসূল ﷺ বলেন, 'জেনে রাখো! মৃত্যুবরণের আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না' (সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭৭১৬; আল জামেউস ছগীর, হা/৪২২৪)। এটিই সালাফে-সালেহীনের আক্বীদা। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে কথিত বক্তাদের মুখে অনেক আল্লাহর ওলী কর্তৃক ৮০, ৯০ ১০০ বার আল্লাহর দর্শনের কাহিনী শোনা যায় যা সবই মিথ্যাচার এবং বানোয়াট।

প্রশ্ন (৩) : যদি কেউ দাবী করে যে, সে কবে মৃত্যুবরণ করবে তা সে জানে। বা কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি বলতে পারে যে, সে কবে মৃত্যুবরণ করবে। এমন আক্বীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: কোথায় কিভাবে কার মৃত্যু হবে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত' (লুক্বমান, ৩১/৩৪)। গায়েবের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না' (আল আন'আম, ৬/৫৯)। অন্যত্র বলেন, 'বল! আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে' (আন নামল, ২৭/৬৫)। অত্র আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু একটি গায়েবী জ্ঞানের বিষয় যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সুতরাং কেউ যদি গায়েবের কোনো বিষয় জানে মর্মে দাবী করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন: মৃত্যু সম্পর্কে অগ্রিম জানে মর্মে দাবী করা। অতএব এমন দাবীদার ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না এবং এদের জানাযা পড়া যাবে না (ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব 'ইবনু বায', ১২/১০৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফতওয়া নং ৩০৯০)।

প্রশ্ন (৪) : কোনো পীরকে হুজুর কেবলা বা বাবা বলা যাবে কি?

-মো: সেলিম রেজা
বাগদাদ, ইরাক্ব।

উত্তর: কোনো পীরকে হুজুর কেবলা বা বাবা বলা যাবে না। কেননা এগুলো কুসংস্কার যা আক্বীদা নষ্টকারী ভ্রান্ত লোকদের আবিস্কৃত শব্দ। তারা এসকল শব্দ দ্বারা বিভিন্ন কুফুরি আক্বীদা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে থাকে। কারণ হুজুর কখনো কেবলা হতে পারে না। আর কেবলা বলতে মূলত কাবা ঘরকে বুঝানো হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে, শুধু কেবলাকেই কেবলা মনে করা এবং অন্যকে কেবলা বলা হতে বিরত থাকা। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে আমাদের মত ছালাত পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবাইকৃত পশু ভক্ষন করে। সেই হলো প্রকৃত মুসলিম...' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯১)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৫) : মারইয়াম বিনতে ইমরান কি জান্নাতে রাসূল (ছা) এর স্ত্রী হবেন?

-সম্রাট হোসেন
গাজীপুর।

উত্তর: শহীদদের উপর আল্লাহ নবীদের মর্যাদা দিবেন এ কথা ঠিক। আর একজন শহীদকে আল্লাহ ৭২ জন স্ত্রী দান করবেন (তিরমিযী, হা/১৬৬৩; ছহীহ আত-তারগীব, হা/১৩৭৪)। তবে, নবীদেরকে কতজন স্ত্রী আল্লাহ দান করবেন তা কোনো ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানা যায় না। আর আসিয়া আ., মারইয়াম আ., মুসা আ. -এর বোন কুলছুমের সাথে জান্নাতে রাসূল ﷺ -এর সাথে বিবাহ দেওয়া হবে মর্মে কোনো ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং এ মর্মে যা পাওয়া যায় তার সবই দূর্বল ও ভিত্তিহীন (জামে'উল আহাদীছ, হা/৬৯২৩; ত্বারানী, ৮/২৫৮ পৃ. হা/৮০০৬; আল-জামেউস ছগীর, হা/৩১৬০ 'হাদীছ দূর্বল')।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৬) : কতটুকু পরিমাণ রক্ত বা পুঁজ শরীর থেকে বের হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে?

-শাইখ মাহমুদ
জামালপুর।

উত্তর: শরীরের গুহ্যদ্বার এবং প্রশাবের প্রণালি ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে কম-বেশি কোনো কিছু বের হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। রক্ত প্রবাহিত হলেও নয়। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ 'যাতুর রিকা' এর যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হলেন এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু তিনি (সে অবস্থায়ই) রুকু করলেন, সিজদা করলেন এবং ছালাত আদায় করতে থাকলেন।... পরবর্তীতে রাসূল ﷺ -কে বিষয়টি অবগত করালে তিনি তার ছালাত হয়নি কিংবা ওযূ ভেঙ্গে গেছে মর্মে কিছুই বলেননি। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসলিমগণ সব সময়েই তাঁদের যখম অবস্থায় ছালাত আদায় করতেন এবং তাঊস রাহিমাহুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু 'আলী রাহিমাহুল্লাহ, 'আতা রাহিমাহুল্লাহ, ও হিজাযবাসীগণ বলেন, রক্তক্ষরণে ওযূ করতে হয় না। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু একবার একটি ছোট ফোঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হল, কিন্তু তিনি ওযূ করলেন না। ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি ছালাত আদায় করতে থাকলেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ও হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ শিঙ্গা লাগালে কেবল তার শিঙ্গা লাগানোর স্থানই ধোয়া প্রয়োজন (ছহীহ বুখারী, হা/১/৪৬ পৃ.)।

প্রশ্ন (৭) : আমার স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। পবিত্র হওয়ার আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর আবার দু'একদিন পর অন্য কালারে রক্ত দেখা যায়। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ঋতুর স্বাভাবিক সময় পর তা থেকে পবিত্র হওয়ার দু'একদিন পর যদি আবার রক্ত দেখা যায়, তাহলে সেটা রোগজনিত কিংবা অন্য কোনো রক্ত। হায়েযের রক্ত নয়। তাই এই রক্ত ধুয়ে ফেলে ছালাত, ছিয়াম, বায়তুল্লাহর তওয়াফ, স্ত্রী সহবাসসহ সকল কাজ করতে পারবে (লাজনা দায়েমা, ৫/৩৮৮)।

প্রশ্ন (৮) : কোনো মেয়ে ঋতু থেকে এমন সময় পবিত্র হয়েছে যে, সে ঠাণ্ডা জ্বরে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করে ছালাত পড়তে পারবে কি? এক্ষেত্রে কি তাকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পানি না পাওয়া, পানির স্বল্পতা, পানি ব্যবহারে অক্ষমতা অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি কিংবা জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা যায়। আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যাতু সালা-সিল যুদ্ধে গিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাময় রাত্রিতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। আমার ভয় হলো যে গোসল করলে আমি বুঝি মারাই যাবো। তাই তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের ছালাত পড়িয়ে দিলাম (ইমামতি করলাম)। আমার সঙ্গীরা রাসূল স. এর সামনে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। রাসূল স. বললেন, আমর! তুমি জুনুবী অবস্থায় তোমার সাথীদের ইমামতি করেছো? আমি তখন তাকে আমার গোসল না করার কারণ সম্পর্কে বললাম, আপনি আল্লাহকে বলতে শুনেননি, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' (আন-নিসা, ৪/২৯)। রাসূল স. এ কথা শুনে হাসতে লাগলেন। কিছু বললেন না (আবূ দাঊদ, হা/৩৩৪)। তাই প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারে। আর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সময় যেহেতু সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়, তাই এক্ষেত্রেও সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে।

ইবাদত- ছালাত

প্রশ্ন (৯) : তাহাজ্জুদ বা যে কোনো নফল ছালাতে কুরআন দেখে দেখে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ বিল্লাহ
দক্ষিণ মৈশুন্ডী, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: নফল ছালাতে কুরআন দেখে পড়ার ব্যাপারে একজন ছাহাবীর আমল পাওয়া যায়। আবূ বকর ইবনু মুলায়কা থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তার এক গোলামকে মুদাব্বার (মালিকের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে এমন দাস) বানাল। সে রামাযান মাসে কুরআন দেখে দেখে পড়ে ইমামতি করতো (মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/৭২৯৪)। তবে এটা শুধু ইমামের জন্য, মুক্তাদীর জন্য নয়। মুক্তাদী শুধু ক্বিরাআত শ্রবণ করবে। আর সুন্নাহ হলো মুখস্থ ক্বিরাআত পড়া।

প্রশ্ন (১০) : আবূ দাউদের ৬৬৬ নং হাদীছ দেখিয়ে জনৈক ব্যক্তি বলেন, যে জামাআতে পায়ে পা কাধে কাধ মিলায় না, সেই জামাআতে ছালাত পড়া যাবে না। এছাড়াও তিনি বলেন, কাতার না মিলালে নাকি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উক্ত বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

-হুসনে মুবারক

উত্তর: ছালাত পড়া যাবে না একথা ঠিক নয়। কেননা অত্র হাদীছে ছালাত হবে না এ কথা বলা হয়নি। তবে, কাতারের ফাঁকা বন্ধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যাক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৮২৪; আল মুজামুল আওসাত্ব, হা/৫৭৯৭)। নু'মান ইবনু বশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৬)। আর প্রশ্নোল্লিখিত হাদীছের অনুবাদ হলো- আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা করো, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও, কাতারের মধ্যকার ফাঁকা যায়গা পূর্ণ করো, ডানা নরম করো (আবূ ঈসা বিআইদি ইখওয়ানিকুম অংশটুকু বলেননি) তোমরা শয়তাদের জন্য ফাঁকা যায়গা রেখে দিয়ো না। ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। আর যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে না/কাতার বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' (নাসাঈ, হা/৮২৭)। বর্ণিত হাদীছের আলোকে বলা যেতে পারে যে, যারা কাতার মিলানোর পক্ষে নয় তারা রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং যারা কাতার মিলনোর পক্ষে কিন্তু মিলাতে পারছে না তারা কাতার মিলানোর নিয়্যত থাকার কারণে রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না। উল্লেখ্য যে, জনৈক ব্যক্তির শেষের কথাটুকু গ্রহণযোগ্য যা এই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন (১১) : যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ে না সেই ব্যক্তি যদি এশার পর এক ও তিন রাকআত উভয়ই নিয়মিত বিতর পড়ে তাহলে ঠিক হবে এবং এক ও তিন রাক'আত বিতর পড়ার পদ্ধতি জানতে চাই?

-গোলাম কিবরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তর: না, ঠিক হবে না। কেননা তখন এক রাতে দুইবার বিতর পড়া হয়ে যাবে যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধ। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'এক রাত্রে দুইবার বিতরের ছালাত আদায় করতে নেই' (আবূ দাউদ, হা/১৪৩৯; তিরমিযী, হা/৪৭০)। এক রাকআত বিতর পড়ার জন্য শুধু সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়ে রুকু সিজদা করে সালামের মাধ্যমে শেষ করবে। তিন রাকআত বিতর পড়ার পদ্ধতি হলো- তিন, পাঁচ রাকআত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝে কোনো বৈঠক করা যাবে না (নাসাঈ, হা/১৭১৮; কুবরা বায়হাক্বী, হা/৪৮০৩; ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৭; মিশকাত, হা/১২৫৬)। উল্লেখ্য যে, তিন রাকআত বিতর ছালাত মাগরিবের তিন রাকআত ফরয ছালাতের মতো মর্মে যে হাদীছ মাযহাবীদের পক্ষ থেকে শুনা যায় তা দূর্বল।

প্রশ্ন (১২) : মসজিদের বাচ্চাদের ধমক দেওয়া যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: কমলমতি শিশুদের সর্বদায় ভালোবাসা আর আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করতে হবে। তাদের সাথে কখনো রুষ্ঠ আচরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করল না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭৩৩; মিশকাত, হা/৪৯৭০)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন, তখন হাসান ও হুসায়ন তাঁর পিঠে চড়তেন। তারা যখন তাদের বাধা দিতে চাইতো, তখন তিনি ইঙ্গিত করতেন, তোমরা তাদের ছেড়ে দাও। যখন তিনি ছালাত শেষ করতেন, তখন তাদের কলে রাখতেন আর বলতেন, যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন এদের ভালোবাসে (মুসনাদে ইবনু আবি শায়বা, হা/৩৯৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১২)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বড় পরহেজগার আর কে আছে। তিনি যদি ছালাতরত অবস্থায় বাচ্চা কলে করে নিয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে গেলে ধমক দিব, তাদের নিয়ে ছালাত আদায় করতে পারব না?। তবে, এমনিতে দুষ্টুমি লাফালাফি করে পরিবেশ নষ্ট করলে, পরিবেশ ঠিক করার জন্য সর্তক করতে পারে।

প্রশ্ন (১৩) : ছালাতরত অবস্থায় সূরা বলার সময় মনের ভুলে বিসবিল্লাহ দুইবার হয়ে যায়। এতে কি কোনো অসুবিধা হবে?

-মো. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: এতে কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা একই আয়াত বার বার পড়ার বিষয়টি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আয়াত দ্বারা রাতে নফল ছালাত পড়লেন। পড়তে পড়তে সকাল করে দিলেন। সে আয়াতটি হলো- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'তাদের অপরাধের জন্য তুমি তাদের শাস্তি দিলে দিতে পার। তারা তো তোমারই বান্দা। তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তা তোমার দয়া), অবশ্যই তুমি বিপুল ক্ষমাশীল প্রজ্ঞাময়' (আল-মায়েদা, ৫/১১৮)। জুহায়না গোত্রের একজন লোক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের উভয় রাকআতে সূরা যিলযাল পড়তে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল করে পাঠ করেছেন নাকি ইচ্ছা করে পাঠ করেছেন (আবূ দাউদ, হা/৮১৬)। এতে বুঝা যায়, কেউ ভুলবসত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাতে দুইবার বিসমিল্লাহ পাঠ করলে তার ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (১৪) : ছালাতুল ইসতিখারা, ছালাতুল ইসতিসক্বা, ছালাতুল হাজাত, ছালাতুত তওবা, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত, ইশরাক ও চাশতের ছালাত, ছালাতুয যুহা এই ছালাতগুলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা, না-কি নফল ছালাত?

-আব্দুল্লাহ
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: ফরজ ছালাত ব্যতীত অন্য সকল ছালাত নফল ছালাত। তবে রাসূলুল্লা ﷺ-এর আমল ও বলার ভঙ্গিমা থেকে বুঝা যায়, এগুলোর কোনোটা কোনোটার চেয়ে গুরুত্ব অনেক বেশি রাখে। ত্বালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নজদ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে একজন লোক আসল। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। তার বুকের ফিস ফিস আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। সে কি বলছিল বুঝা যাচ্ছিল না। সে রাসূলের নিকটে আসা মাত্রই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি দিনে রাতে পাঁচ বার ছালাত আদায় করবে। লোকটি বলল, এছাড়া আমার উপর কোনো করণীয় আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তবে তুমি ইচ্ছা করলে নফল ছালাত আদায় করত পার... (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১)।

প্রশ্ন (১৫) : একাকী ছালাত পড়ার সময় মাগরিব-এশার প্রথম দুই রাকআতে ক্বিরাআত কি উচ্চৈস্বরে, না-কি চুপি চুপি পড়ব?

-নূরুল হুদা
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: জাহরী ছালাত একাকী পড়লেও ক্বিরাআত উচ্চৈস্বরে পড়তে হবে। উচ্চৈস্বরে ক্বিরাআত পড়া সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা –কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- রাসূল ﷺ কি রাতে ছালাত আদায় করার সময় উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ! তিনি কখনো উচ্চৈস্বরে আবার কখনো নিম্নোস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৩৪৪)। এছাড়াও আবূ বকর, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা একাকী ছালাত আদায় করার সময় উচ্চৈস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করেছেন (আবূ দাউদ, হা/১৩৩০; মিশকাত, হা/১২০৪)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, একাকী জাহরী ছালাত আদায় করলে উচ্চৈস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (১৬) : মসজিদের পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে কবর এবং মিম্বরের নিচে কবর আছে, কবরগুলো ৫০ বছরেরও বেশি পুরাতন, এই মসজিদে ছালাত পড়ার বিধান কী?

-মুহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম
ফেনী।

উত্তর: এমন মসজিদে ছালাত হবে না। কারণ কবরস্থানের দিকে, মাঝে, উপরে ছালাত আদায় করা হারাম (আবূ দাঊদ, হা/৪৯২; তিরমিযী, হা/৩১৭; মিশকাত, হা/৭৩৭)। আবূ মারছাদ আল-গানাভী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরকে সামনে করে ছালাত আদায় করো না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৫৫)। আবূ মারছাদ আল-গানাভী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরকে সামনে করে ছালাত আদায় করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৬৯৮, ২৩১৫, ২৩২২ 'সনদ ছহীহ')। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কবর ক্বিবলার সামনে, পিছনে, ডানে বা বামে যেদিকেই থাক না কেন ছালাত হবে না (আস-সামারুল মুস্তাত্বাবু ফী ফিকহিস্ সুন্নাহ ওয়াল কিতাব, পৃ. ৩৫৭)। তাছাড়া রাসূল ﷺ কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৬৯৮, ২৩১৫, ২৩২২ 'সনদ ছহীহ')।

প্রশ্ন (১৭) : ১. জান্নাতের চাবি ছালাত? ২. জান্নাতের চাবি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ? কথা দুটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-মোবারক হোসেন
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: জান্নাতের চাবি ছালাত মর্মে যে অংশটুকু হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ (তিরমিযী, ১/৪; হেদায়াতুর রুয়াত, পৃ. ২৮১)। আর লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ জান্নাতের চাবি মর্মেও যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সেটিও যঈফ (আল-কামেল ফিয যুআফা, ৫/৬০; ইসলাম ওয়ায়েব, ফতওয়া নং- ১২৮৪৭১)।

প্রশ্ন (১৮) : ছালাতরত অবস্থায় সিজদায় মুখে তাসবীহ পাঠ করতে করতে অন্তরে আল্লাহ কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো বলা যাবে কি?

-মাজহারুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: মুখে উচ্চারণ না করলে সমস্যা নেই। তবে উচ্চারণ করা যাবে না। কেননা তা কালামুন নাস (ব্যক্তিগত কথা) হিসাবে গণ্য হবে যা ছালাতে সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ। মু'আবিয়া ইবনু হাকাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'অবশ্যই ছালাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়, এটা তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্যই সুনির্দিষ্ট (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭)। তাই তা নিজের ভাষা ব্যতিরেকে শরীআত কর্তৃক বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে হতে হবে। (১) سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى (২) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا (৩) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى (৪) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ইত্যাদি। আরো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে ছালাত শেষে বা অন্য যেকোনো সময় হাত তুলে দু'আ করতে পারে। সালমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয়

তোমাদের প্রতিপালক সম্মানিত ও লজ্জাশীল। যখন কোনো বান্দা তার কাছে দুই হাত উত্তোলন করে তখন তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন' (আবূ দাউদ, হা/১৪৮৮)।

প্রশ্ন (১৯) : প্রতি রফউল ইয়াদায়েনে ১০টি করে নেকি লাভ সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সনদসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

-মো. রোকনুযযামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: জী, হাদীছটি ছহীহ (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৮৬)। সনদসহ পুরো হাদীছটি হলো- বিশর ইবনু মূসা ও আব্দুর রহমান ইবনু আল-মুকরী ইবনু লাহীআ' হতে, লাহীআ' ইবনু হুবাইরা হতে, ইবনু হুবাইরা আবূ মুছআব মিশরাহ ইবনু হাআন আল-মাআফিরী হতে, তিনি উক্বা ইবনু আমের আল-জুহানীকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মানুষ ছালাতে তার হাত দ্বারা যে ইশারা করে থাকে, (এর বিনিময়ে) তার প্রত্যেক আঙ্গুলে একটি করে নেকি বা মর্যাদা লেখা হয়' (মু'জামুল কাবীর, হা/৮১৯)।

মসজিদ সংক্রান্ত বিধান

প্রশ্ন (২০) : মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেয়া যাবে না তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো- হারানো ঘোষণা ছাড়া অন্য ঘোষণা (যেমন আগুন লেগেছে বলে তাৎক্ষণিক সতর্কতা) দেয়া যাবে কি। হারানো জিনিসের ঘোষণার নিষেধাজ্ঞা এক্ষেত্রে ব্যাপক নাকি সীমাবদ্ধ?

-সজিব হোসেন
সাথিয়া, পাবনা।

উত্তর: হারানো জিনিসের ঘোষণা ব্যতীত আকস্মিক বিপদের ঘোষণা যেমন- হটাৎ আগুন, বন্যা বা ডাকাতের আক্রমণ, প্রবল বৃষ্টি ইত্যাদি তাহলে, উপায়ান্তর না পেলে মসজিদের মাইক দ্বারা করা যায়। আবুল মালিহ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তারা হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ –এর সাথে অবস্থান করছিলেন। এমতাস্থায় বৃষ্টি হলো। তখন একজন আহ্বানকারী (আযানের মাঝে) ঘোষণা দিলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িতে ছালাত আদায় করো (মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৭০২)। নাফে' রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, ঠান্ডা এবং প্রবল বাতাসের রাতে ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আযান শেষে ঘোষণা দিয়ে বললেন, শোনো! বাড়িতে ছালাত পড়, শোনো! বাড়িতে ছালাত পড়, শোনো! বাড়িতে ছালাত পড়, (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৮০০)। আর মসজিদে যেসকল কর্ম নিষিদ্ধ তা হচ্ছে-আমর ইবনু শু'আইব রহিমাহুল্লাহ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারানো বস্তু তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন' (আবূ দাউদ, হা/১০৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬৭৬)। মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা (ফতহুল কাদীর, ২/১২৮; ফতহুল বারী, ৬/২৮)। অতএব মসজিদে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যতিরেকে বিপদাপদের ঘোষনা দেওয়াতে শারঈ কোন বাধা নেই। 'মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা নিষিদ্ধ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি হারানো বস্তুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (২১) : মা-বাবা কি সন্তানকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ দিতে পারে?

-সালাউদ্দীন
ভাসানটেক, ঢাকা।

উত্তর: মা-বাবা সন্তানকে মিথ্যা পতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ দিতে পারে না। কেননা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া কাবীরা গুনাহ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের (আদর্শের) অন্তর্ভুক্ত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে দিবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করছো? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ করা হতো' (আবূ দাউদ, হা/৪৯৯১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৭৪৮)। অতএব সন্তানকে সবকিছু জানিয়ে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন (২২) : কাবিন করা বউকে তার বাপের বাড়িতে রাখা কি শরিয়াতসম্মত?

-রাকিব
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: বিবাহের কাবিননামা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এখন থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষন, বাসস্থান সবকিছুর জিম্মাদারী স্বামীর উপর। অতএব স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ করে তার নিজ নিবাসে নিয়ে যাওয়া এবং সংসার জীবন আরম্ভ করা। আল্লাহ বলেন, 'জনকের (স্বামী) উপর দায়িত্ব হল বিহিতভাবে প্রসূতিদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা' (আল বাকারা, ২/২৩৩)। রাসূল ﷺ বলেন, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'তাদের জন্য তোমাদের উপর বিহিতভাবে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭৪)। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে শ্বশুর-শাশুড়ী অসন্তোষ হলে, স্ত্রীকে তার শ্বশুরালয়ে রাখা জায়েয হবে না। তবে, প্রয়োজনে তাদের আপত্তি না থাকলে, সাময়িকভাবে থাকতে পারে বা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, কনে নাবালিকা হলে শাবালিকা হওয়া পর্যন্ত বাবার বাড়ীতে থাকবে। যেমন: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ৬ বা ৭ বছর বয়সে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। ৯ বছর বয়সে আল্লাহর রাসূল ﷺ –এর সাথে তার শ্বশুরালয়ে মিলন হয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন। সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছে ছয় বছর। আর তিনি আমার নয় বছর বয়সে আমার সাথে বাসর যাপন করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৫৮; আবূ দাউদ, হা/২১২১)।

প্রশ্ন (২৩) : যদি কোনো ছেলে-মেয়ে পরস্পর একে অন্যের মা ব্যতীত তৃতীয় কোনো মহিলা থেকে দুজনে দুধ পান করে, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ জায়েয হবে কি?

-আনিসুল হক
বেইজিং, চীন।

উত্তর: না; তাদের মাঝে বিবাহ বৈধ হবে না। কেননা তারা দুধ ভাই-বোন। আর দুধ ভাই-বোনের মাঝে বিবাহ হারাম। যেমনভাবে বংশীয় কারণে বিবাহ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে... তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে...’ (আন নিসা, ৪/২৩)। রাসূল ﷺ বলেন, ‘জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম’ (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫)। তবে দুই বছর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর পান করলে তাতে দুধ ভাই-বোন সাব্যস্ত হবে না। তাই তারা চাইলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ﴾ ‘তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে’ (লুক্বমান, ৩১/১৪)। উকবা ইবনুল হারেস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনু ’আযীয -এর কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর জনৈকা মহিলা এসে বলল, আমি ’উকবা এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি (তাদের বিবাহ কি বৈধ?)। ’উকবা উক্ত মহিলাটিকে বললেন, আপনি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছেন (আমি জানি না) এবং তা কক্ষণো আমাকে বলেননি। অতঃপর তিনি (’উকবা ইবনুল হারেস) তার স্ত্রীর পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, উত্তরে তারা বলল যে, ঐ মহিলাটি যে আমাদের কন্যাকে দুধ পান করিয়েছে, তা আমরাও জানি না। অতঃপর ’উকবা মদীনায় এসে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে, যেহেতু একটি কথা (দুধপানের ব্যাপারে) উঠেছে? এটা শুনে ’উকবা তার স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন (তালাক দিলেন) এবং ঐ স্ত্রী অন্যত্র অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো (ছহীহ বুখারী, হা/৮৮; মিশকাত, হা/৩১৬৯)।

প্রশ্ন (২৪) : তালাক দেওয়ার সময় কি ‘বায়েন’ শব্দ উল্লেখ করা জরুরি?

-আব্দুল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর: ‘তালাক’ শব্দের সাথে ‘বায়েন’ শব্দ বলা না বলার সাথে তালাকের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তালাকে বায়েন বলতে বুঝায় যে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর ৯০দিন অতিক্রম হওয়ার পর স্ত্রী বায়েন হয়ে যায়। এর পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে তা বায়েন হিসাবে গণ্য হয় না। অতএব কেউ যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করে শুধু তালাক শব্দ উচ্চারণ করে তাতেই তালাক হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তিনটি বিষয়ের চূড়ান্তও চূড়ান্ত আর হাসিতামাশাও চূড়ান্ত; (১) বিবাহ, (২) তালাক ও (৩) প্রত্যাহার’ (ইবনু মাজাহ, হা/২০৩৯)। অত্র হাদীছেও প্রমাণিত হয় যে, বায়েন বলা জরুরী নয়। শুধু তালাক বললেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৫) : বিবাহতে বরকে অর্ধেক লাড্ডু বা অর্ধেক শরবত খাওয়ানো বাকি অর্ধেক কনেকে খাওয়ানো কি সুন্নাহ বা মুস্তাহাব কিছু?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত যা করা হয় যেমন গেট তৈরি, গান-বাজনা, আলোকসজ্জা, গায়েহলুদ অনুষ্ঠান, যৌতুক গ্রহণ, বৌভাতের অনুষ্ঠান করে চাঁদাবাজি, সবার সামনে বরকে অর্ধেক লাড্ডু বা শরবত খাওয়ানো বাকি অর্ধেক কনেকে এর সবই হারাম। কেননা এসব বিধর্মীদের থেকে আসা কুসংস্কার। যা করলে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ বা অনুসরণ করা হয়। যা স্পষ্ট হারাম। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো কওমের (সম্প্রদায়ের) অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১; বুলূগুল মারাম, হা/১৪৭১)। তবে, নির্লজ্জের মতো মানুষের সামনে না করে স্বামী-স্ত্রী একান্ত নির্জনে একে অপরকে যেভাবে ইচ্ছা খাওয়াতে ও পান করাতে পারে এবং তা সুন্নত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পানপাত্র থেকে পান করতাম তখন আমি ছিলাম ঋতুমতী। তারপর আমি তা নবী সা. -এর নিকট প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখের স্থানে তার মুখ রেখে পান করতেন এবং ঋতুমতী অবস্থায় আমি গোশতযুক্ত হাড় হতে গোশত খেতাম আর তা নবী ﷺ-এর হাতে প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে নিজের মুখ রাখতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০)। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘...আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে’ (তারও প্রতিদান পাবে) (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬)।

প্রশ্ন (২৬) : আমার ৩ বছর বয়সী একটি ছেলে বাচ্চা আছে আল্লাহর রহমতে চার মাসের একটি মেয়ে বাচ্চাও আছে, স্ত্রী আবারও বাচ্চা কনসিভ করেছে। বর্তমানে দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু সে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে না। কারণ দুই

বাচ্চাকে লালনপালন করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। বাড়িতে সদস্য সংখ্যা ৮ (আট) জন। বাড়ির সকল কাজকর্ম অনেকাংশেই সে একাই করে। স্বামী হিসেবে এখন আমার করণীয় কী? আল্লাহর কাছে গুনাহগার হতে চাই না।

-হাসান সবুজ
পরশুরাম, ফেনী।

উত্তর: গর্ভে ভ্রূণ আসার পর সামাজিক লজ্জা, কাজকর্মের চাপ, চাকুরির অসুবিধা, সন্তানের দেখভাল করা কষ্টকর ইত্যাদি অজুহাতে তা নষ্ট করা জায়েয নয়। কেননা তা সন্তান হত্যার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ 'আর যখন জীবন্ত প্রথিত শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে' (আত-তাকভীর, ৮১/০৮-০৯)। তাছাড়া গর্ভপাত করার স্বাস্থ্যগত ক্ষতিও অনেক আছে। পরবর্তীতে গর্ভ ধারণে সমস্যা, মাসিকের ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তাই এই কাজ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

জানাযা- মৃত্যু, কাফন-দাফন

প্রশ্ন (২৭) : আমাদের এলাকাসহ হানাফী মাযহাবের অনুসারি দাবিদার মুসলিম ভাইয়েরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিৎ করে দাফন করে, এটি কি সুন্নাহসম্মত?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: না; এটি সুন্নাহসম্মত নয়। বরং মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে ক্বিবলা মুখি করে দাফন দিতে হবে। উমায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, যিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোনগুলি কবীরা গুনাহ? তিনি বললেন, এর সংখ্যা নয়টি। '...মুসলিম পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং তোমাদের জীবন-মরণে কাবা ঘরকে কেবলা হিসেবে মেনে নেওয়া (আবূ দাউদ, হা/২৮৭৫ 'হাদীছটি হাসান')। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মায়্যেতকে ডান পার্শ্বে কিবলা মুখি করে রাখতে হবে। চিৎ করে মুখ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে রাখার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৮) : অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা ঋতুমতী নারী মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: 'অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা ঋতুমতী নারী মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে নিষেধ প্রমাণিত নয়। আর মুসলিমরা পবিত্র। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হল। তখন আমি জুনুবী (অপবিত্র) ছিলাম। তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করার ইচ্ছা করলেন। আমি বললাম, আমি অপবিত্র। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭১; মুসনাদে বাযযার, হা/২৮৯৬)। উল্লেখ্য যে, ঋতুমতী নারী দুটি কাজ করতে পারে না: ১. ছালাত ২. কাবা ঘরের ত্বওয়াব (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৮, ১৫৬৭)।

প্রশ্ন (২৯) : কবরের গভীরতার ব্যাপারে শরীআতের কোনো নির্দেশনা আছে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: কবরকে গভীর করা সুন্নাত। হিশাম ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলাম যে, প্রত্যেকের জন্য কবর খনন করাতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উত্তরে বললেন, 'তোমরা (কবরকে) খনন কর, গভীর কর এবং সুন্দর কর' (নাসাঈ, হা/২০১০)। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসে কবর খননকারীকে বলেছিলেন, 'তুমি মাথা ও উভয় পায়ের দিক প্রসস্থ কর' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৫১২)। কেননা উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরের গভীরতা বেশি করাই ভালো। যার মাধ্যমে তার দূর্গন্ধ ও পশু-পাখীর ক্ষতি হতে লাশ নিরাপদে থাকবে। তবে কবরের গভীরতার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। চাই তা পুরুষ, মহিলা, ছোট-বড় যার জন্যই হোক না কেন (আশ-শারহুল মুমতে', ৫/৩৬০)।

প্রশ্ন (৩০) : মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জানতে চাই।

-ফয়সাল আহমেদ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারে। তবে তারা সেখানে গিয়ে বিলাপ করতে পারবে না। যদি বিলাপ করার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন নারী কবর যিয়ারত করা থেকে বিরত থাকবে। বাড়ি থেকেই কবর বাসীর জন্য দু'আ করবে। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বিলাপ করে ক্রন্দরত কোনো এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তা দেখে তিনি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধারন করো (ছহীহ বুখারী, হা/১২৫২)। ইবনু বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম তোমরা এখন কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩০৫৫)।

দান-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (৩১) : মসজিদ নির্মাণ করার জন্য টাকা দান করলে তা নির্মাণ কাজে ব্যয় হবে। আর আবাদী জমি দান করলে তা লিজ রেখে তা থেকে প্রাপ্ত টাকা প্রতি বছর মসজিদ

উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম- জমি দান না-কি জমির সমমূল্যের টাকা দান?

-আব্দুর রউফ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: জমি দান করে দিবে। পরবর্তীতে মসজিদ কতৃপক্ষ চাইলে বিক্রয় করবে চাইলে রেখে দিবে। তবে জমি দান করাই বেশি উত্তম হবে। কেননা জমি দান করলে এর স্থায়িত্ব বেশি হবে এবং টাকা দান করলে এর স্থায়িত্ব কম হবে। দান করা জিনিস থেকে মানুষ যতদিন উপকার লাভ করতে থাকবে ততদিন ব্যক্তি ছওয়াব পেতে থাকবে। এমনকি লোকটি যদি মারা যায় তথাপি ছওয়া পেতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করে তারাই যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ছাড়া কেউকে ভয় করে না। অবশ্যই তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অর্ন্তভুক্ত' (আত-তওবা, ০৯/১৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ আবাদ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (একটি ঘর) নির্মাণ করবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৩)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় (এবং ছওয়াব বন্ধ হয়ে যায়)। কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব মরার পর পেতে থাকে। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া তথা চলমান ছাদাক্বা, ২. বিদ্যা যার দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে, ৩. নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৬১৩)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩২) : ইউটিউব থেকে যে ইনকাম হয় তা কি বৈধ?

-সালাউদ্দীন
ভাসানটেক, ঢাকা।

উত্তর: ইউটিউব থেকে ইনকাম করার মাধ্যমই হলো কোনো কোম্পানির পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা। ভিডিওতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ছাড়া ইনকাম করার কোনো রাস্তাই নেই। আবার ইউটিউব কখন কোন বিজ্ঞাপন দেখাবে, তা ইউটিউবারের ইচ্ছার অধীন নয়। বরং সব কিছু ইউটিউব নিয়ন্ত্রণ করে। এতে হারাম পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে। আবার পণ্য হালাল হলেও নগ্ন নারীদের তেলেসমাতি থাকে। যার কারণে ইউটিউব থেকে উপার্জন করা হতে বিরত থাকা কর্তব্য। কেননা এতে অন্যায়ে সহযোগিতার পাশাপাশি হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর দুটি থেকেই বেঁচে থাকা জরুরি। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর (আল মায়েদা, ৫/২)। রাসূল ﷺ বলেন, 'হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট এর মাঝে যা আছে সবই সন্দেহভাজন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৪৬)।

প্রশ্ন (৩৩) : আমি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একজন শিক্ষার্থী, বর্তমানে আমাদের রাজ্যের সরকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প শুরু করেছে, এটা কি ইসলামী দৃষ্টিতে বৈধ?

-গাযী আবূ যার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: সম্প্রতি West Bengal Student Credit Card Scheme in Bengali- WBSCCS সিস্টেম চালু করেছে। যার মাধ্যমে একজন ছাত্রকে স্বল্প সূদে (অর্থাৎ ৪%- ৩%) পড়া-লেখার আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। এ অর্থ তারা শুধুমাত্র পড়া-লেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারে। অন্য কোথাও নয়। এধরণের প্রকাশ্য সূদের ঘোষণাদানকারী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা সূদ সামান্য হলেও হারাম। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। সুতরাং এসব ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৪) : কোনো ঔষধ কোম্পানীর প্রডাক্ট লিখে দেওয়ার বিনিময়ে কোনো ডাক্তার যদি কোম্পানীর নিকট টাকা নেয়, তাহলে সেই টাকা নেওয়া কি জায়েয হবে? উল্লেখ্য, ডাক্তার রোগীর প্রয়োজন হলেই কেবল ঔষধ লিখে। তবে কোন কোম্পানির প্রডাক্ট লিখবে সেটা ডাক্তার নির্ধারণ করে।

-মাহাবুবুর আলম
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

উত্তর: কোনো কোম্পানীর ঔষুধ লেখার শর্তে কোম্পানী যদি ডাক্তারকে উপহার কিংবা টাকা দেয়, তাহলে তা সুস্পষ্ট ঘুষ হবে। সেটা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা ডাক্তার যদি সেই কোম্পানীর ঔষুধ না লিখে তাহলে তো কোম্পানী তাকে এক পয়সাও দিবে না। এমনকি কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াও যদি উপহার দিতে আসে, তাহলে সেটাও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা 'দান মানুষের জবান বন্ধ করে দেয়'। তখন বিবেকে না চাইলেও মনের দিক থেকে ডাক্তার উক্ত কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন। অথচ ডাক্তারের কর্তব্য হলো, কোম্পানীর ঔষুধের গুণগত মান, কার্যকারিতা ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে প্রেসক্রাইব করা। আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার কারণে যদি সে তাকে কিছু উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে তাহলে সে সূদের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো (আবূ দাউদ, হা/৩৫৪১)। আর হ্যাঁ, কোম্পানী যদি খুব উদার, দানশীল ও পরোপকারী হয়, তাহলে ডাক্তারকে ঘুষ না দিয়ে কোম্পানীর উচিত হত-দরিদ্র অচিকিৎসায়

কাতরানো হাসপাতালের রোগীদের মাঝে ফ্রি ঔষুধ বিতরণ করা। অথবা হাসপাতালের গেটে ঔষুধের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রেসক্রিপশন দেখে দেখে রোগীদের মাঝে ঔষুধ বিতরণ করা। তাতে কোম্পানীর প্রচারও হবে। আবার ছওয়াবের পাল্লাটাও ভারি হবে।

প্রশ্ন (৩৫) : একটি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। তারা বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ শাখায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনলাইন (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ) ও অফলাইন প্রচারের জন্য তারা আমাকে নিতে চাচ্ছে। মূলত প্রচার কার্যক্রমের সব লেখা, ডকুমেন্ট- এগুলো তৈরি করা, এডিট করা, এসব কাজে নিয়োজিত সদস্যদের পরিচালনা করা, রোহিঙ্গাদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে প্রধান কাজ। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন; যিনি একজন ইহুদি ছিলেন। সংস্থাটির বর্তমান প্রধান ডেভিড মিলিব্যান্ড; তিনিও একজন ইহুদি এবং ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদ। এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করা জায়েয হবে কি?

-শাহনেওয়াজ খান
পল্লবী, ঢাকা-ক্যান্ট, ঢাকা।

উত্তর: অমুসলিম সাহায্য সংস্থায় কাজ করা কিংবা তাদের সাহায্য গ্রহণ করার বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ব্যাপার। কেননা তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কোনো মুসলিমকে সাহায্য করে না। বাহ্যত তারা মুসলিমদের সাহায্য করার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে তাদের মিশনারী কার্যক্রম চালিয়ে যায়। সাহায্যের নামে তারা অসহায় গরীব-দুঃখী মুসলিমদের ঈমান হরণ করার ফন্দি আঁটতে থাকে। জনসচেতনতার নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতির আকর্ষণসহ নানা রকম ইসলামী বিরোধী চিন্তা মুসলিমদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। তাছাড়া অসহায় মুসলিমদের ডকুমেন্ট নিয়ে অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমদের অসহায়ত্ব প্রচার করবে, যা অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া সাহায্যের আড়ালে মুসলিমদের ভিতরে তাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে দিতে পারে। যারা মুসলিমদের মাঝে ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর চেষ্টা করে। অথবা এই অসহায় লোকগুলোকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কাজ করানোর ধান্ধায় থাকে। তাই এসব সংস্থায় কাজ করা থেকে বিরত থাকাই উচিত। কেননা তারা কখনোই মুসলিমদের বন্ধু নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না’ (আল মায়েদা, ৫/৫১)।

প্রশ্ন (৩৬) : সব ব্যাংকই সূদ দেয়। আমার একটি অ্যাকাউন্ট করা প্রয়োজন এক্ষণে আমার করণীয় কী?

-রিফাত মাহমুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা।

উত্তর: সূদ হারাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ‘ওরা সকলেই সমান’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, হা/১২০৬)। অতএব সূদ থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তবে, বাধ্যগতভাবে যদি ব্যাংকে টাকা রাখতেই হয় তাহলে, রাখা যায়। সেক্ষেত্রে শুধু মূলধন রেখে বাকি অর্থ ফকীর-মিসকীনদেরকে অথবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে ছওয়াবের নিয়্যত ছাড়া দিয়ে দিবে। কারণ আল্লাহ নিজে পবিত্র। আর পবিত্র ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১৪/২৭পৃ.; হবে (মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনু বায, ১৯/২৬৮ পৃ.)। আল্লাহ ভালো জানেন!

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (৩৭) : গলায় স্কুলের identy card ঝুলানো যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-রাফিক হোসেন
কুচবিহার।

উত্তর: গলায় স্কুলের Identy card ঝুলানো জায়েয। কেননা তা শুধু পরিচয়ের জন্য ঝুলানো হয়ে থাকে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তবে, তা ছবি মুক্ত হওয়া উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ছবি-মূর্তি অঙ্কনকারীদেরকে (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯; নাসাঈ, হা/৫৩৬৪)। অন্য হাদীছে তিনি ﷺ বলেন, ‘ঐ বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না; যে বাড়িতে কুকুর ও ছবি-মূর্তি থাকে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬০৫)। তবে, যদি ছবি যুক্ত করতে বাধ্য করা হয় তাহলে, উপায়ান্তর না পেলে বাধ্য অবস্থায় ছবি যুক্ত করতে পারে। কেননা বাধ্যগত পরিস্থিতিতে হারাম জিনিস সাময়িকভাবে হালাল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘অথচ আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে যদি তোমরা নিরূপায় হও (আল আন‘আম, ৬/১১৯)। (তবে ততটুকু নিষিদ্ধ বস্তু খেতে পার যাতে প্রাণে পাঁচতে পার)। তবে, অবশ্যই ছালাতের সময় তা খুলে লুকিয়ে রাখতে হবে।

সম্পদ বণ্টন নীতিমালা

প্রশ্ন (৩৮) : এক মহিলা পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এক ছেলেকে দান করে রেজি: করে দিয়েছে। ছেলে সে জমির খতিয়ান খুলে খাজনা আদায় করছে। সে মহিলার আরো ৩ মেয়ে আছে। তাদেরকে বঞ্চিত করায় তার ভিতর

আল্লাহর ভয় ঢুকেছে। সে বাকি ৩ মেয়েকে সম্পদ দেওয়ার জন্য কোর্টে মামলা করেছে। কোর্ট আজ-কাল করছে আর ঘুরাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে-দান করা জমি ফেরত নেওয়া যাবে কি?

-গোলাম কাদের

চট্টগ্রাম।

উত্তর: সামাজিকভাবে সম্ভব না হলে মামলা করে হলেও এমন দান ফেরত নিতে হবে। কেননা এর মাঝে অন্যান্য সন্তানদের হক্ব রয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পিতা জীবদ্দশায় তাকে একটি দাস দান করলেন এবং সাক্ষী বানানোর জন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। বললেন, আমি আমার এই সন্তানকে একটি দাস দান করেছি এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী বানাতে এসেছি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দিয়েছো? তার পিতা বলল, না; রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৭; মিশকাত, হা/৩০১৯)। সুতরাং যেহেতু জমি এক সন্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, তাই সে সন্তান যদি ফেরত দিতে না চাই তাহলে, কোর্টের সহযোগিতায় জমি ফেরত নিয়ে সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা আবশ্যক। অন্যথায় হক্ব নষ্টের কারণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ওয়ারেছদেরকে দান/ওছীয়ত করা জায়েয নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হক্বদারের ন্যায্য হক্ব প্রদান করেছেন। শোনো! ওয়ারিছদের জন্য কোনো ওছীয়ত বা দান নেই' (ইবনু মাজাহ, হা/২৭১৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব বুঝিয়ে দাও' (বায়হাক্বী কুবরা, হা/৮৪১৪)। সুতরাং এই দান ফেরত নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৩৯) : বাবার মৃত্যুর পর বাবার সকল সম্পদ মা দখল করে নিজের মত করে ভোগ করতে পারবে কি?

-সালাউদ্দীন

ভাসানটেক, ঢাকা।

উত্তর: না; বাবার মৃত্যুর পর মা তার সকল সম্পদ দখল করে ভোগ করতে পারে না। বরং ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদ দ্বারা কাফন-দাফন সম্পন্ন করে যে সকল সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা ওয়ারিছদের মাঝে প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী ভাগ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কেননা ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদের মালিকানা তার ওয়ারিছদের মাঝে অংশানুপাতে বণ্টিত হয়ে যায়। তাই স্ত্রী হিসাবে সে আট ভাগের একভাগ (মৃতের যদি সন্তান থেকে থাকে) বা চারভাগের একভাগ (যদি সন্তান না থাকে) পাবে, বাকি অংশ অন্যান্য ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে। এক্ষেত্রে মা যদি সকল সম্পদ দখল করে ভোগ করে তাহলে অবশ্যই তা যুলুম হবে। আর যুলুমের শাস্তি ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ কর না' (আল আনফাল, ৮/২৭)। সাঈদ ইবনু যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফায়েল রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত (অর্ধহাত) জমি জোর দখল করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত স্তর যমীন বেড়িরূপে পরিয়ে দিবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬১০; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/৯৫৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, '(কিয়ামতের দিন) গাদ্দারের জন্য একটি পতাকা তোলা হবে এবং বলা হবে যে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৭৭)। তিনি আরো বলেন, 'যুলুম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৯)।

প্রশ্ন (৪০) : নিজের প্রাপ্য অংশ পাওয়ার জন্য ভাই-বোন বা অন্য আত্মীয়দের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে কি?

-সালাউদ্দীন

ভাসানটেক, ঢাকা।

উত্তর: প্রথমে সামাজিকভাবে নিজের ওয়ারিছ সূত্রে পাওয়া অংশ উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা হিসেবে মামলা করতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন (আবূ দাউদ, হা/৩৫৬৫; নাসাঈ, হা/৩৬৪১)। এখন কেউ যদি কারো অধিকার খর্ব করে তাহলে, সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। যেমন সাহাবীগণ নিজের হক্ব আদায়ের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ নিয়ে আসতেন (আবূ দাউদ, হা/৩৬১৬, ৩৬৩১)। তবে, এর মাঝেও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪; মিশকাত, হা/৪৯২২)।

দু'আ- যিকির-আযকার

প্রশ্ন (৪১) : রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা লাভের উপায় জানতে চাই।

-ফারহাদ হোসেন

সখিপুর, শরিয়তপুর।

উত্তর: রিযিকে প্রশস্ততা লাভের অনেক মাধ্যম কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞাতার্থে কয়েকটি উল্লেখ্য করা হলো- **১. তাক্বওয়ার (আল্লাহভীতি) পথ অবলম্বন করা।** মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযিক' (আত-তালাক্ব, ৬৫/২-৩)। **২. পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া।** মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দেবেন' (নূহ, ৭১/১০-১২)। **৩. আল্লাহর উপর**

পূর্ণ ভরসা রাখা। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহর উপর প্রকৃতভাবে ভরসা করতে পারো তাহলে, তিনি তোমাদেরকে পাখির ন্যায় রিযিক দান করবেন। অর্থাৎ পাখি যেমন খালি পেটে সকালে বের হয় সন্ধায় ভর্তি পেটে ফিরে আসে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৫; ইবনু মাজাহ, হা/৪১৬৪)। **৪. বেশি বেশি দান করা।** মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ সূদকে মিটিয়ে দেন এবং দানকে বর্ধিত করেন’ (আল বাকারা, ২/২৭৬)। **৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।** আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি স্বীয় রিযিক বৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবী হতে চাই সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭)। **৬. বিবাহ করা।** আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক- যে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চাই (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৯; মুসনাদে বাযযার, হা/৮৫০০)। **৭. ছালাতুয যুহা আদায় করা।** আবূ উমামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিনের শুরুভাগে চার রাকআত ছালাত আদায় করো আমি তোমার জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যাবো’ (আল মুজামুল কাবীর, হা/৭৭৪৬; শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী, ৪/১৪৪ পৃ.)। **৮. বেশি বেশি দু‘আ করা। (ক).** اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ **(খ).** اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ (আবূ দাউদ, হা/১৫৪৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৩১)। এছাড়াও হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য দু‘আসহ নিজ ভাষায় আল্লাহর নিকট রিযিক চাইতে হবে।

ঋণ আদান-প্রদান

প্রশ্ন (৪২) : ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ দাতাকে খুঁজে না পায় তাহলে কিভাবে ঋণ আদায় করবে?

-সাব্বির আহমাদ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

উত্তর: প্রথমে তার ওয়ারিছ খুঁজে বের করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। যদি কোনভাবেই না পাওয়া যায় তাহলে উক্ত সম্পদ তার নামে বায়তুল মাল বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দিবে (আশ-শারহুল মুমতে‘ ‘উছায়মীন’, ১০/৩৮৮; আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১১/২২৬; ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৯/৩২১)। তবে, পরবর্তীতে যদি কখনো সে ব্যক্তি ফিরে আসে এবং তার পাওনা দাবী করে তাহলে, তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে (লাজনা দায়েমা, ১৪/৪১)।

পোষাক-পরিচ্ছদ

প্রশ্ন (৪৩) : লোহার তৈরি আংটি ব্যবহার করা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: লোহার আংটি ব্যবহার করাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সাহল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত যে, একজন মহিলা এসে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিজেকে (বিবাহের জন্য) পেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিন। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তোমার কাছে (মোহরানা স্বরূপ) কী আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, যাও, তালাশ কর, কোন কিছু পাও কিনা? দেখ যদি একটি লোহার আংটিও পাও’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৩; আল মুজামুল কাবীর, হা/৫৯০৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২৪/৬৪; ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব ‘উছায়মীন’, ১১/৫৭; ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব, ‘ইবনু বায’, ৭/২৮৯; আল মাজমু‘ লিন নববী, ৪/৪৬৫)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, লোহার আংটি পরিধান করা জায়েয। লোহার আংটি ব্যবহার করা যাবে না মর্মে বর্ণিত আবূ দাউদ, তিরমিযীর হাদীছ দুর্বল (আবূ দাউদ, হা/৪২২৩; তিরমিযী, হা/১৭৮৫ ‘দুর্বল’)।

তাক্বলীদের বিধান

প্রশ্ন (৪৪) : তাক্বলীদ করা কী সবার জন্য হারাম? এ ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য জানতে চাই।

-তাজবির উল হক
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তাক্বলীদ হলো- কোন শারঈ বিষয়ে কারো কথাকে বিনা দলীল-প্রমাণে চোখ বুজে গ্রহণ করা (জুরজানী, কিতাবুত তা‘রীফ, ৬৪ পৃ.)। ইত্তেবা হলো- বিশুদ্ধ দলীল অনুযায়ী রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলা হয় (আল ক্বওলুল মুফীদ ‘শাওকানী’, ১৪ পৃ.)। তাক্বলীদ অর্থ অন্ধ অনুসরণ যা সবার জন্য হারাম। হোক না সে আলেম কিংবা সাধারণ কোনো ব্যক্তি। কেননা স্বর্ণ যুগ থেকে ৪র্থ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত কোনো মাযহাব ছিল না। তখন সাধারণ মানুষ, আলেম-উলামার কেউ তাক্বলীদ করেনি। চার মাযহাবের আবির্ভাব ঘটেছে তাবে-তাবেঈনদের পরে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন মুসলিমরা নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/১৫২-৫৩, ‘চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ)। অত্র বিবরণে বুঝা যায়, ভারতীয় বিদ্বানদের নিকটেও ৪০০ হিজরীর পূর্বে কোন

মাযহাব ছিল না। **তাক্বলীদের ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য:** ১. ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه 'আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি, তা না জেনে আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়' (হাশিয়া ইবনু আবেদীন, ৬/২৯৩)। 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব' (হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন ১/৬৩)। ২. ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুললাহ ছা-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক' (ইবনু আবী হাতেম, পৃ. ৯৩)। ৩. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ কর না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তাঁরা যে উৎস হতে গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর' (ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/৩০২)। ৪. ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূলে হবে তা প্রত্যাখ্যান কর' (ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/১৪৯)। এসকল বক্তব্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তাক্বলীদ সালাফদের নিকট একটি গর্হিত কাজ ছিল।

কুসংস্কার

প্রশ্ন (৪৫) : নবজাতক শিশুকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া এবং তার আক্বীকার উদ্দেশ্যে খানা-পিনার ব্যাপক আয়োজন করা কি শরী'আত সম্মত?

উত্তর: এগুলো সামাজিক কুসংস্কার। নবজাতক শিশুর আক্বীকার জন্য খানা-পিনার ব্যাপক আয়োজন করা ও তাকে হাদিয়া দেয়া শরী'আত সম্মত নয়। তবে আক্বীকার গোশত আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে হাদিয়া স্বরূপ বন্টন করা যায় এবং প্রয়োজনে তা রান্না করে খাওয়ানো যায় (বায়হাক্বী, ৯/৩০২ পৃ.)। অনুরূপ কোন দিন নির্ধারণ ছাড়াই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য হাদিয়া দেয়া যেতে পারে। কারণ পরস্পরকে হাদিয়া দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, 'রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিয়া কবুল করতেন। কেউ তাঁকে হাদিয়া দিলে তিনিও তাকে হাদিয়া দিয়ে পাঠাতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫; মিশকাত, হা/১৮২৬)।

প্রশ্ন (৪৬) : ফেসবুকে জন্মদিন উইশ (শুভ কামনা জানানো) করা কতটুকু শরীআতসম্মত?

-আব্দুল খালেক
রাজশাহী।

উত্তর: জন্মদিন পালন করা এবং এ উপলক্ষে উইশ (wish) করা বা শুভকামনা জানানো কিংবা উপহার প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা তা অমুসলিমদের সংস্কৃতি। ইসলামে অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণ করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হোক তা ইবাদতের ক্ষেত্রে কিংবা আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি বা কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে হোক। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে কেউ অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১)। সুতরাং এ উপলক্ষে কাউকে উইশ (wish) করা, শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো, গিফট দেয়া, কেক কাটা, মোমবাতি জ্বালানো বা ফুঁ দিয়ে নিভানো, বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা, জন্ম দিনের পার্টি করা সবই হারাম।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৭) : আমাদেরকে (আহলেহাদীছদের) অন্যান্য লোকেরা ইয়াহুদীদের দালাল বলে, তখন আমার খুব কান্না পাই, আমার সান্ত্বনা কী?

-মো. মহিদুল ইসলাম
বিসমিল্লাহ গোট ফার্ম, যশোর।

উত্তর: একজন মুসলিমের উচিত হবে কোনো মুসলিম ভাইকে বিদ্রুপ করা কিংবা মন্দ নামে ডাকা হতে বিরত থাকা। কারণ তা একটি গর্হিত কাজ। যা কখনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। কেউ যদি কোনো মুসলিমকে কাফের কিংবা ইহুদি-খ্রিস্টান বলে সম্বোধন করে তাহলে, সে গালি উল্টা তার উপর কার্যকর হবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ তার ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করলে উভয়ের একজন কাফের হয়ে যাবে। যাকে কাফের বলা হয়েছে সে কাফের হলে তো হলই নতুবা কথাটি বক্তার উপরই ফিরে আসবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬০; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৪৪২)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন, '...তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নাম কতই না মন্দ! যারা তওবা না করে তারাই যালেম' (আল-হুযরাত, ৪৯/১১)। অত্র আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, কাউকে মন্দ নামে ডাকা যাবে না। অতএব এ ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং সফলতা ও গুনাহ মাফের আশা করা। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১; মিশকাত, হা/১৫৩৭)। এছাড়াও রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জেনে রেখো! তোমার অপছন্দনীয়

বিষয়ের প্রতি ধৈর্য ধারণ করাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। আর ধৈর্য্যর সাথেই রয়েছে বিজয়' (মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৯)।

প্রশ্ন (৪৮) : হোমিও চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরিতে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর: হোমিও ওষুধ খাওয়া যাবে। কেননা তাতে যে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তা মদ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই (উছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১১/২৫৬-২৬০)।

প্রশ্ন (৪৯): একজন যুবক হিসেবে বাবা-মাকে নছীহা করার উপায় কী?

-আব্দুল্লাহ আস-সা'দ
মতিহার, রাজশাহী।

উত্তর: পিতামাতা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানী মানুষ। আল্লাহ তাআলা নিজের পরে পরে তাদেরকে স্থান দিয়েছেন। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ও আদব-আখলাক, আচার-ব্যবহার ঠিক রেখে তাদেরকে নছীহত করতে হবে। নছীহা করতে গিয়ে নরম স্বরে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। কঠোর শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার কাছে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তখন বিরক্তিভরে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না। তাদেরকে ধমক দিও না। বরং তাদেরকে কোমল কথা বলো' (আল ইসরা, ১৭/২৩)। তাদের জন্য বেশি বেশি দু'আ করতে হবে। প্রয়োজনে সৎ লোকদের কাছে দু'আ চাইতে হবে। যেমনটি আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মায়ের হেদায়াতের জন্য নবী স.কে দু'আ করতে বলেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৯১)।

প্রশ্ন (৫০) : ইসলামী ইতিহাস জানার জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুহাম্মদ সাজেদুল হক রানা
চট্টগ্রাম।

উত্তর: ইসলামের ইতিহাস জানার জন্য অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো- ১. তারীখুত-ত্বাবারী ২. আল-বিদায়া ওয়ান-নেহায়া ৩. আর-রাহিক্বুল মাখতুম ৪. আত তারীখুল ইসলামী মাহমুদ শাকের।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

মাসিক আল-ইতিছাম-এর
৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে

ইতিছাম পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

রেজিস্ট্রেশন
০১ নভেম্বর ২০২২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পরীক্ষার তারিখ ও সময়
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
শুক্রবার, রাত ৮টা (অনলাইনে)

ফলাফল ঘোষণা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
পুরস্কার বিতরণ ৩ মার্চ ২০২৩
সালাফী কনফারেন্স, নারায়ণগঞ্জ

বিষয়: মাসিক আল-ইতিছাম ৬ষ্ঠ বর্ষ (নভেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ সংখ্যা)
৬ষ্ঠ বর্ষ একসাথে বোর্ড বাইন্ডিং পেতে অর্ডার করুন: ০১৪০৭-০২১৮৪০

নিয়মাবলি

- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার, রাত ৮টায় অনলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ৩০ মিনিট পূর্বে রেজিস্ট্রেশন এ প্রাপ্ত মোবাইল নাম্বারে পরীক্ষার লিংক এসএমএস পাঠানো হবে। ঠিক ৮টায় প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।
- রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০ টাকা পেমেন্ট করতে হবে। বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বার: **০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭** (পেমেন্টের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কনফর্মেশন এসএমএস পাঠানো হবে।)
(এসএমএস না পেলে যোগাযোগ: ০১৪০৭-০২১৮৪০)

রেজিস্টেশন লিংক:
al-itisam.com/প্রতিযোগিতা
অথবা স্ক্যান করুন

- এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়: ৬০ মিনিট; মোট প্রশ্ন: ১০০টি; পূর্ণমান: ১০০। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে ও ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

পুরস্কারসমূহ ১৬৫টি

১ম পুরস্কার
নগদ ৩০ হাজার টাকা+ক্রেস্ট ও সনদ

২য় পুরস্কার
নগদ ২৫ হাজার টাকা+ক্রেস্ট ও সনদ

৩য় পুরস্কার
নগদ ২০ হাজার টাকা+ক্রেস্ট ও সনদ

৪র্থ পুরস্কার
নগদ ১৫ হাজার টাকা

৫ম পুরস্কার
নগদ ১০ হাজার টাকা

৬ষ্ঠ পুরস্কার
নগদ ৫ হাজার টাকা (১০টি)

৭ম পুরস্কার
৪৫০ টাকার মূল্যমানের ১ বছরের মাসিক আল-ইতিছাম এর ১ কপির ফ্রি গ্রাহক সুবিধা। (৫০টি)

৮ম পুরস্কার
২২৫ টাকার মূল্যমানের ৬ মাসের মাসিক আল-ইতিছাম এর ১ কপির ফ্রি গ্রাহক সুবিধা। (১০০টি)

মোট ২ লক্ষ টাকার সমমূল্যের পুরস্কার

আয়োজনে: নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এস-১২২৮৮-২০১৬)

নাজাতের একমাত্র অবলম্বন! بفهم السلف الصالح সালাফী মানহাজের অনুসরণ!

সালাফী কনফারেন্স ২০২২-২৩

সভাপতি

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

রাজশাহী
৬ষ্ঠ বার্ষিক
২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০২২
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে

দিনাজপুর
২য় বার্ষিক
০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: জুম'আর খুৎবার মধ্য দিয়ে

নারায়ণগঞ্জ
৭ম বার্ষিক
০২ ও ০৩ মার্চ ২০২৩
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গণ
সময়: ১ম দিন বাদ আসর হতে

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

ব্যবস্থাপনায়: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু